মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১৬ – ৩০ নভেম্বর ১৯৮৪



আমাদের মেয়েরা আরও বেশি করে
এগিয়ে আসুক – ইন্দিরা গান্ধী



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

মতামত

সংযোজন

'সুকন্যা'র ১ – ১৫ আগস্ট '৮৪ সংখ্যায় 'পছন্দ মতন খান, মেদভার কমান' লেখাটির সঙ্গে আরো কয়েকটি নিয়মের সংযোজন করা যেতে পারে।

১) সহজপাচ্য শাকসবজি খেয়ে প্রথমে পেট ভরিয়ে ফেলুন। পরে রুচিমত অল্প খাবার খান।

২) দিনে ৪ বারের বদলে অন্তত ৬ বার খাবার অভ্যাস করুন। কিন্তু বেশিরভাগ স্ন্যাকস-জাতীয়। এতে পেটে পিত্তি পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না, অথচ কম খাওয়া চলবে।

৩) যত কাজই করুন না কেন সকালে বা বিকেলে বেড়াবার অভ্যাস করুন।

৪) দুপুরে ঘুমের বদলে সেলাই করুন, বই পড়ুন বা বাচ্চাদের 'হোম টাস্ক' তৈরি করুন।

৫) সকালে লেবুজল খাবেন। জল সামান্য গরম করে তাতে আধখানা পাতিলেবু টিপে রস বার করে দেবেন ও তারপর খাবেন।

৬) নিজের দৈনন্দিন পরার কাপড়-চোপড় নিজেই কাচুন। এতে পরিচ্ছন্নতার বোধটি যেমন তৃপ্ত হবে তেমনি পেশী সঞ্চালনও হবে।

ওপরের ইঙ্গিতগুলির মধ্যে খাবার কথা থেকে আমরা সরে এসেছি ঠিকই, কিন্তু এই নিয়মগুলি পালন করলে এর সুফল অবশ্যম্ভাবী।

পিয়ালী বসু
কলকাতা – ৪৭

স্ত্রী স্বাধীনতা কি কথার কথা?

'সুকন্যা' ১৬ – ৩১ আগস্ট '৮৪ সংখ্যায় ভারতী সাহার লেখা 'স্বাধীনোত্তর যুগে স্ত্রী স্বাধীনতা' পড়লাম। আমার মনে কয়েকটি প্রশ্ন এসেছে। সে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

লেখিকা গতানুগতিক পদ্ধতিতে নারী স্বাধীনতা কতখানি কথার কথা তাই বলেছেন। অবশ্য এর মধ্যে সারা ভারতে কৃতী নারীর সংখ্যাও কম নয়।

আমরা যারা শিক্ষিতা, সমাজের অগ্রগতিতে মনে করি আমাদের ভূমিকা আছেই, তারা একবারও কি ভেবে দেখেছি আমাদের বুদ্ধিমত্তার কত অপচয় হচ্ছে! শিক্ষিতার সংখ্যা গ্রাম এবং শহরে ভিন্নরকম, আবার বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষেত্রেও এই তফাত দেখা যায়।

যে কোনো একটি শহরের শিক্ষিতা মেয়েদের কথাই ধরা যাক। সাধারণ হিসেবে বি এ পাশের পরেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। তারপর সেই মেয়ে বধূ হয়ে ভুলে যায় একদিন সে কলেজের ভালো খেলোয়াড় ছিল, নাচতো ভালো, গানের দিকে নজর ছিল। তখন অধিকাংশ বধূই পরনিন্দা-পরচর্চায় কাল কাটায় বা সংসারের জাঁতায় নিজেদের নিষ্পেষিত করে।

এবার যদি গ্রামের দিকে তাকাই, হয়ত দেখব কোনো মেয়ের কোনো বিষয়ে নিপুণতা ছিল। আমি একটি মেয়েকে জানি যার সাধারণ প্রবণতা ছিল শাড়ির পাড়ের নতুন নকশা আঁকার। তাঁতি বাবার অনেক পাড়ের নকশাদার সে। তার বাবা রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পায় মেয়ের আঁকা নকশাকে রূপ দিয়ে। কিন্তু বিয়ের পর সে পরপর তিনটি সন্তানের জননী হয়ে কোনদিন রঙ-তুলি হাতে ধরেনি।

এই হল বুদ্ধিমত্তা অপব্যয়ের ছোট্ট দুটি উদাহরণ।

মনীষা বিশ্বাস
চুঁচুড়া, হুগলী

সংসার ব্যয় ও বাজার দর

'সুকন্যা' ১ – ১৫ সেপ্টেম্বর '৮৪ সংখ্যায় 'সংসার ব্যয় : পঞ্চাশ বছর আগে ও পরে' যেমন মনোজ্ঞ তেমনি সময়োপযোগী। আজকের দিনে সবকিছু এমন দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে যে, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে আকাশ-পাতাল ফারাক চোখে পড়ে। আজকের দিনে যা সত্য কাল তা অলীক কল্পনায় পরিণত হচ্ছে।

আমরা গৃহবধূ যারা ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাদের পক্ষে সব কিছুর সঙ্গে এই দ্রুত বাজার দর বৃদ্ধি হয়ে যাওয়া আজ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তাই ঠাকুমা নয়, মায়ের আমলের বাজার দরও মেয়ের কাছে স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে সম্ভাব্য খরচের হিসেব দিয়ে আমাদের মত গৃহবধূদের উপকার করেছেন, তার জন্য অজস্র ধন্যবাদ।

শুধু একটি প্রশ্ন : ৯৫০ টাকা মাস-মাইনের হিসেবে যেখানে তেলের হিসেব দেখানো হয়েছে এবং রোজকার খাবার তালিকা দেখানো হয়েছে, সেখানে রান্না এবং তেলের হিসেবে মিল দেখতে পাইনি।

কণিকা ধর
হাওড়া – ১

সম্পাদকীয়

ইন্দিরা স্মরণে



শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর আমাদের মধ্যে নেই; গত ৩১ অক্টোবর – বুধবার আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। এই ঘটনা এমনই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং মর্মান্তিক যে, ইন্দিরাজীর মৃত্যু-সংবাদে সমস্ত দেশ বিমূঢ় ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। হতচকিত ও স্তব্ধ হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এমন মৃত্যুর তুলনা আর একটিমাত্র রয়েছে। মহাত্মাজীর মৃত্যু। সেই মৃত্যুও এমনই অভাবিত, সহসা এবং নির্মম। প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগের সেই দিনটিকে স্মরণ করলে দেখতে পাব, কোটি কোটি ভারতবাসী সেদিন যেমন বিহ্বল, শোকাতুর হয়ে পড়েছিল, এত বছর পরে আজ আবার একইরকম স্তব্ধতা নামল ইন্দিরাজীর মৃত্যু- সংবাদে। মহাত্মাজীর হত্যার ঘটনা এক বিরাট কলঙ্ক হয়ে আমাদের এখনও ঘিরে আছে। ইন্দিরাজীর হত্যায় আমরা নিজেদের আরও কলঙ্কিত করলাম। একথা স্বীকার করতেই হবে, দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের কাছে যিনি প্রায়-জননীতুল্য হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর হত্যাকান্ডের ঘটনায় দেশবাসী শুধু শোকাভিভূত হয়নি – প্রচন্ড ক্রোধে দিশেহারা হয়ে উঠেছিল। দেশ জুড়ে এক অশান্তি, হানাহানিও ঘটেছে কিছুটা। সৌভাগ্যের কথা, অশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। শুভবোধসম্পন্ন সকলেই স্বীকার করবেন, সাম্প্রদায়িক হিংসার দ্বারা আমাদের কিছু লাভ হয় না।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবন এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। তাঁর বিচিত্র কর্মজীবনের বৃত্তান্ত ভারতবাসীর জানা আছে। তবু বলা দরকার – প্রবল ব্যক্তিত্বে, বিচক্ষণতায়, চারিত্রিক কাঠিন্যে ইন্দিরাজী যেন এক তেজস্বিতার প্রতীক। তাঁর সাহস, স্বদেশপ্রেম, স্বাতন্ত্র্যবোধ কাকে না অভিভূত করেছে! কে না স্বীকার করবে যে, ভারতের মতন বিরাট বহুভাষিক উন্নয়নকামী একটি দেশকে জগৎসভায় মর্যাদার আসনে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অন্তর্ধানে আমাদের সর্বতোভাবে যে ক্ষতি হল, ভবিষ্যতে হয়ত তা হৃদয়ংগম করতে পারব। আজ আমরা শোকাহত, ইন্দিরাজীর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রসংগত একটি কথা এখানে বলা দরকার। এই পত্রিকার পক্ষ থেকে কিছুকাল পূর্বে শ্রীমতী গান্ধীর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। আমাদের সাধ ছিল ইন্দিরাজীর আটষট্টিতম জন্মদিন (১৯ নভেম্বর '৮৪) উপলক্ষে আমাদের ১৬ নভেম্বর '৮৪ সংখ্যায় সেটি প্রকাশ করব। আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল কিন্তু এমন বেদনাদায়ক ইচ্ছাপূরণ ঘটবে তা আমরা কল্পনাও করিনি।

সুকন্যা

বর্ষ ১ সংখ্যা ১১/১৬-৩০ নভেম্বর ১৯৮৪
৩০ কার্তিক-১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৯১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী
শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয় দপ্তর ও রেজিঃ অফিস : ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২


বূস্ট সারাটা দিন এগিয়ে চলায়
বূস্ট অফুরন্ত শক্তি যোগায়
রোজ সকালে আপনার ছেলের দুধের গেলাসে সুস্বাদু, শক্তিদায়ক বূস্ট মিশিয়ে দিন।
দেখুন ও কেমন ছুটন্ত ট্রেনের মত সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলে সারাটা দিন।
সকালের স্কুল, হৈ হৈ করে ফুটবল খেলা, আবার মন দিয়ে হোমওয়ার্ক করা—সব কিছুতেই প্রচুর উৎসাহ।
এই হল বূস্টের আশ্চর্য শক্তি!
আপনার ছেলেকে টগবগ, স্ফূর্তিময় দিন কাটাতে সাহায্য করে সারাদিন।
ক্রীমে ভরা দুধ, সোনালী গমের দানা, মল্টেড বার্লি আর সুস্বাদু কোকোর গুণে ভরপুর, বূস্ট আপনার বাচ্চাকে শক্তিদায়ক কার্বোহাইড্রেট আর স্বাস্থ্য গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটীন যোগাবে।
Boost
MALT CHOCOLATE MILK DRINK
প্রাণচঞ্চল জীবনের জন্য অফুরান শক্তির রসদ



‘সুকন্যা’কে ইন্দিরা গান্ধী

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সাক্ষাৎকারটি নেন শ্রীমতী গায়ত্রী রায়

"The hand that rules the country, had also nocked the cradle" যে হাত আজ দেশ শাসন করছে, সেই হাতই কি একদিন শিশুকে দোলনায় ঘুম পাড়িয়েছে? কি করে? কেমন ভাবে? মনের মধ্যে এই সব প্রশ্নের ঢেউ তুলে সম্মুখীন হলাম ইন্দিরা গান্ধীর। মিষ্টি হেসে সাদর সম্ভাষণ জানালেন; বসতে বললেন। আমার কিন্তু সাময়িক দৌর্বল্য কাটছে না! যখন সব বাধা অতিক্রম করে অবশেষে গিয়ে পৌঁছলাম সাউথ ব্লকের করিডোর বেয়ে – মুখোমুখি হলাম পৃথিবীর সেরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর।

কপাল ঠুকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রীর প্রচার উপদেষ্টা শ্রীসারদাপ্রসাদের কাছে। বন্ধুমহলে ঠাট্টা উঠেছিল – শ্রীমতী গান্ধী নাকি বিদেশী পত্রিকা ছাড়া সাক্ষাৎকার দেন না – তার উপর আবার মেয়েদের পত্রিকা? নৈব নৈব চ! এখানে উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেও কিন্তু কেউ কেউ এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কারণ সম্মতিসূচক চিঠি নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে যখন হাজিরা দিলাম সাউথ ব্লকে, তখন অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – আমি লন্ডন বা নিউইয়র্ক থেকে আসছি কিনা। জবাব শুনে তাঁরা আশ্চর্য হলেন, ‘সুকন্যা’ ভারত থেকে প্রকাশিত পত্রিকা এবং তাতে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী রাজি হয়েছেন।

ওয়েটিং রুমে অর্থাৎ ভি আই পি-দের সুসজ্জিত বিরাট বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করতে বলা হল। করিডোরে দেখা হল সারদাপ্রসাদজীর সঙ্গে – হন্তদন্ত হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ঘরের দিকে ছুটছেন। প্রধানমন্ত্রীর সব সরকারি আলোচনায় তিনি উপস্থিত থাকেন সাউথ ব্লকে।

দলে ভারী হলে জোর পাওয়া যায় – আমার কিন্তু সে গুড়ে বালি। অনুরোধ জানিয়েছিলাম সহকর্মী সাংবাদিক তরুণপ্রকাশ গাঙ্গুলিকে ফটোগ্রাফার হিসাবে নিয়ে যাবার জন্য – সেটা মঞ্জুর হল না। তাই একাই লটবহর নিয়ে রওনা দিলাম। লটবহর অর্থে বিরাট এক ক্যাসেট রেকর্ডার এবং বাড়তি কয়েকটি ক্যাসেট। যে জিনিসের জন্য যত আগে থেকে প্রস্তুতি করা হয়, তাতেই আখেরে কোন না কোন বাধা পড়ে। আমারও তাই হল – শেষমুহূর্তে ছোট পকেট ক্যাসেট রেকর্ডারটা ডুবিয়ে দিল; রেকর্ডিং-এর বোতামটা নষ্ট হয়ে গেল। তখন অনেক রাত্রে দৌড়াদৌড়ি করে যোগাড় করলাম একটি বিকল্প যেটা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বেশ প্রমাণ সাইজের! এবং ওজনেও বেশ ভারী।

সাউথ ব্লকের ৬ নম্বর গেটের

রিসেপশন ডেস্ক অফিসার আমার অবস্থা দেখে হাসি চাপলেন – চাপরাসীকে ডেকে বললেন, আমার বোঝা ওপরে সারদাপ্রসাদজীর ঘরে পৌঁছে দিতে। সেখানে হল অ্যান্টি ক্লাইম্যাক্স – জানা গেল মেশিনটা আনবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সব ব্যবস্থা নাকি ওখানেই আছে – রেকর্ডিং থেকে ট্রান্সস্ক্রিপ্ট পর্যন্ত ওঁরাই করে দেবেন। যাইহোক, যা হবার হয়ে গেছে – ভাবলাম পরের বারে ঝাড়া হাত পা হয়ে এসে এর সুযোগ নেব।

শ্রীমতী গান্ধীর দপ্তরে ঢুকতে হয় শ্রীধাওয়ানের ঘরের মধ্যে দিয়ে। চির অনুগত বিশ্বস্ত শ্রীধাওয়ান দিনের প্রতিটি জাগ্রত মুহূর্তে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে থাকেন ছায়ার মত। সাংবাদিক সংক্রান্ত ব্যাপারে উপস্থিত থাকেন শ্রীসারদাপ্রসাদ। বিরাট লম্বা টেবিলের পিছনে প্রধানমন্ত্রী বসে। আমি ঢুকতেই সম্ভাষণ জানালেন। আমি ক্ষমা চাইলাম আমার বিসদৃশ মেশিনটার জন্য। দেখলাম আরো দুটি ছোট পকেট ক্যাসেট রেকর্ডার মজুত। ফটোগ্রাফার ক্যামেরাতে ক্লিক করলেন। শুরু হল আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর।

কে যেন বলেছিলেন – "শক্তির মাঝেই সুন্দর বাস করে – আর কঠোরও যে কোমল হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে" – প্রশ্নোত্তরের অধিবেশন যত এগোচ্ছে, ততই এই উক্তির যথার্থতা আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগল। প্রতিটি জিজ্ঞাসার কি সুন্দর প্রাঞ্জল জবাব দিলেন উনি – অতীতের পারিবারিক ঘটনা, বর্তমানে ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি, নারী প্রগতি, সামাজিক উন্নয়ন থেকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সব বিষয়েই আলোচনা হল। দু-একটি প্রশ্ন একটু লজ্জাদায়ক ছিল। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ইতস্তত করলেন না – সহজভাবেই জবাব দিলেন।

'সুকন্যা'র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গৃহের চার দেয়ালের পটভূমিকায় গৃহিণীরূপে, নারী রূপে, ইন্দিরাজীর পরিচিতি তুলে ধরা। বিরাট এই উপমহাদেশ পরিচালনার দায়িত্বের ভারে, তাঁর চরিত্রের এই দিকটা জনসমক্ষে খুব অল্পই প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা গান্ধী মায়ের ভূমিকায়, পিতামহীর ভূমিকায়-এ ধরনের সাক্ষাৎকারও খুবই বিরল। 'সুকন্যা'র মাধ্যমে জানা গেল বাইরের শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও গৃহস্থালীর এবং সংসারের খুঁটিনাটি তিনি অবহেলা করেন না। এবং প্রায় প্রতিদিনই পরিবারের সকলের সংগে একত্র হন খাওয়ার টেবিলে।

সন্তান মানুষ করার ঝামেলাও যে তিনি পুইয়েছেন, সেই প্রসংগে বললেন – "আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি স্বাধীনচেতা – তাদের উপর যে নজর রাখা হচ্ছে, বুঝতে দেওয়া উচিত নয়। তাহলেই গণ্ডগোল বাধে – ওরা বিদ্রোহ করে বসে।"

ঘরে বাইরে একাধারে কিভাবে সামলেছেন তার প্রমাণস্বরূপ একটি ছোট উদাহরণ দিলেন। সঞ্জয় যখন ছোট, নার্সারিতে পড়ে, তখন একদিন তার একটি ক্লাসের বন্ধু বাড়িতে খেলতে এসেছিল। ছেলেটির মা পরে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আসেন, এবং কথাচ্ছলে প্রশ্ন তোলেন শ্রীমতী গান্ধীর নিশ্চয়ই খুব অল্প সময় থাকে সঞ্জয়ের সংগে কাটাবার জন্য। এর জবাব আকস্মিকভাবে সঞ্জয়ের কাছ থেকেই এল। সে তার বন্ধুকে বলল – "তুমিই না বলেছিলে, যে তোমার মা রাত্রিদিন খালি তাস খেলেন, আর বাড়িতে মোটে থাকেন না? আমি আমার মাকে অনেক বেশি কাছে পাই তোমার চাইতে!"

হাসতে হাসতে কাহিনী সমাপ্ত করে ইন্দিরাজী বললেন – "It is a question of 'organising your life" – সুসংগঠনের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনটাকে সাজাতে হয়। তাহলেই আর মুশকিল হয় না। বাচ্চারা যখন ছোট, মায়ের সান্নিধ্যের বেশি প্রয়োজন হয়। তখন সেইভাবে মানিয়ে নিতে হয় নিজেকে।

যাঁরা ঘর সামলে, ছেলেমেয়েদের সুব্যবস্থা করে ঘরের বাইরে কাজ করতে বেরিয়েছেন, কখনও কখনও কি কোন অপরাধবোধ মানসিকতায় ভোগেন? দিনান্তে বাড়িতে ফিরে কি মনে হয় – ঘরসংসারকে অবহেলা করার দোষে দোষী আপনি? বোধকরি যেতে আসতে দু-একটি মন্তব্য আপনার কানে এসেছে – যাতে এই অপরাধবোধ আপনার মধ্যে চাগিয়ে উঠেছে? শ্রীমতী গান্ধী এই প্রসংগে বললেন – "If anybody has guilt feeling it is equally the husband and other people in the household" – যদি সত্যি অপরাধবোধ শুরু হয়ে থাকে, তার সমান ভাগ মাথা পেতে নিতে হবে স্বামীকে পরিবারের আর সকলের সংগে। কারণ জগৎ এগিয়ে চলেছে, আমাদের দেশের সামাজিক চিন্তাধারা কিন্তু এখনও মাঝপথে থেমে আছে। সংস্কারগুলি এখনও পুরোপুরি দূর করা যায়নি অথচ যুগের হাওয়া দাবি করছে নতুন পদ্ধতি, নতুন আচরণ। ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হবার পরে মেয়েরা ধাপে ধাপে কত এগিয়ে গেছে – শিল্পে, বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে, সমাজের প্রতি স্তরে আজ মেয়েরা সমানভাবে কাজ করছে পুরুষের পাশাপাশি। তা সত্ত্বেও যে অবিচার, অন্যায়ের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তার প্রধান কারণ নারী জাতির আর্থিক পরাধীনতা।

পুরুষ যদি উপলব্ধি করে, স্ত্রীর



ইন্দিরাজীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন শ্রীমতী গায়ত্রী রায়

"মুরোদ আছে রোজগার করবার" – তাহলেই তাকে সমীহ করে চলবে। শ্রীমতী গান্ধী বলেন – "If the woman is economically independant, she can hold her own and I think it could be a happier home" – নারীর যদি আর্থিক স্বাধীনতা থাকে, তাহলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে এবং সংসারে শান্তি বজায় থাকে। তবে তিনি এও বলেন, এই পরিবর্তন ধাপে ধাপে আনতে হবে। সামাজিক চিন্তাধারা বদলে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মেয়েদের চাহিদা এবং ক্ষমতা ইত্যাদির তুলনামূলক গবেষণা করে, সেই অনুযায়ী এ বিষয়ে

'পণ' শব্দটাই সামাজিক অভিধান থেকে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু সচেতন থাকতে হবে যাতে অন্য কোন ছদ্মনামের আড়ালে পণপ্রথা চালু না হয়।

রয়েছে।

'পণপ্রথা সম্বন্ধে শ্রীমতী গান্ধীর খুব কড়া অভিমত। 'সুকন্যা'র সুরে সুর

সংশোধনী উত্থাপিত হতে দেরি হচ্ছে, কারণ পার্লামেন্টের অ্যান্টি-ডাউরি সাব কমিটি বিবাহ-খরচ বাবদ যে টাকার অঙ্ক ধার্য করেছিলেন, তা মোটেই কার্যকরী নয়। তাছাড়া কোনটা বাধ্য হয়ে দেওয়া, আর কোনটা ভালবেসে ইচ্ছাকৃত উপহার, এ দুয়ের মধ্যে ভেদাভেদ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। কাজেই কোনটা পণ, আর কোনটা পণ নয়, সর্বপ্রথম এটাই প্রমাণ করা দরকার। তাই পার্লামেন্টে আইন পাশ করলেও সামাজিক চিন্তা প্রবাহ না বদলানো পর্যন্ত মেয়েদের স্থান সুদৃঢ় হবে না।

যেমন ধরুন বধূদাহ – সতীদাহ ইংরেজ



দুই পুত্র – রাজীব ও সঞ্জয় এবং পুত্রবধূ সোনিয়ার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী

উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা দেওয়া প্রয়োজন। শুধু আইন দিয়ে চালু করা যাবে না – তার সঙ্গে দেশে এবং সমাজে অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আমরা যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নারী আন্দোলনে না ভুলি – সেখানে আজও ERA (Equal Rights Amendment) পাশ হল না। মেয়েদের সেখানে পুরুষের চেয়েও দ্বিগুণ খেটে স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়। আমাদের দেশে তার প্রয়োজন নেই কারণ সংবিধানে সম-অধিকারের গ্যারান্টি

মিলিয়ে জোর দিয়ে সমর্থন করলেন, 'পণ' শব্দটাই সামাজিক অভিধান থেকে তুলে দেওয়া উচিত। কিন্তু সচেতন থাকতে হবে যাতে অন্য কোন ছদ্মনামের আড়ালে পণপ্রথা চালু না হয়। লোকসভায় 'doury prohibition act'-এর

"রাজনীতি আমার জীবিকা নয়, পেশা নয় – এ আমার জীবন – জীবনদর্শন।"

শাসকরা আইন দ্বারা বন্ধ করেছিলেন – কিন্তু সমাজে সেটা স্বীকার করে নিতে বহুদিন লেগেছিল। আইন দিয়ে কুকার্য করার ইচ্ছাটা শাসন করা যায়, কিন্তু মানসিকতা বদলানো যায় না। বিশেষ করে অর্থলিপ্সা, আর পার্থিব ঐশ্বর্যের লালসা মানুষকে এত নিচে টেনে নিয়ে যায়, যখন সে নিজের ঘরের বউকেও পুড়িয়ে মারতে দ্বিধা বোধ করে না। এদের সাজা কি শুধু আইন মারফত দেওয়া সম্ভব?

শ্রীমতী গান্ধী বললেন, সেকালে গ্রামে একটি রীতি ছিল যখন সমাজ-অসংগত

কোন কাজ করলে তাকে একঘরে করে রাখা হত। যেমন অসবর্ণ বিবাহ করলে অনেক সময়ে ধোপা নাপিত বন্ধ করা হত। এখন সেরকম বিধান সমাজ-শীর্ষকেরা দিন না বধূদাহের অপরাধীদের। সমাজে একঘরে হয়ে থাকা, রাস্তায় বেরলে লোকদের টিটকারি শোনা, বিয়ে-সাদী-শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত না হওয়া, পাড়া পড়শীরা কথা বন্ধ করা, এর চেয়ে আর বড় অপমান কি হতে পারে? মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, মানসিক শাস্তির প্রভাব দৈহিক শাস্তির চেয়ে অনেক বেশি কড়া এবং দীর্ঘস্থায়ী। তাই আইনের সাজার বদলে মানসিক দন্ডের বিধানই কার্যকরী হবে।

শ্রীমতী গান্ধী বিশেষ করে জোর দেন স্ত্রীশিক্ষার উপর। বধূদাহের ব্যাপারে শ্বশ্রূমাতাও কি জড়িত নন? সুশিক্ষার অভাবে, সমাজে প্রাপ্য সম্মান এবং যোগ্য আসন আদায় করে নিতে পারছে না বলেই আজ নারীজাতির মধ্যে এত অসন্তোষ এবং একতার অভাব। যোগ্য স্থান পেলে তারা নিজেরাই নিজেদের সামাল দেবে, নিজেদের সমস্যার সমাধান তারা নিজেরাই খুঁজবে। শিক্ষার থেকেই শক্তির উদ্ভব হয় – জাতির উন্নতির জন্য স্ত্রীশক্তির প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীও এই কারণেই স্ত্রীশক্তির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ডাকে হাজারে হাজারে স্ত্রীলোক সাড়া দিয়েছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অসহযোগ আন্দোলনে পুরুষের সংগে। সর্বসাধারণের মংগলের জন্য নারী জাগরণের প্রয়োজন; আধা দুনিয়ার অধিবাসী (নারী) যদি অন্ধকারে থাকে তাহলে সমাজ যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যাবে। ভগ্নাংশের কখনো পূর্ণতা প্রাপ্তি হতে পারে?



গোয়াতে NAM-এর বিরতির সময় ফিরন পরিহিতা শ্রীমতী গান্ধী, সংগে শ্রীমতী মার্গারেট থ্যাচার

রাষ্ট্রের, পররাষ্ট্রের এবং বিশ্বের নানান জটিল ব্যাপারে যে মহিলা অহোরাত্র লিপ্ত, রাজনীতি কি তাঁর পেশা? শ্রীমতী গান্ধী এর জবাবে মৃদু হেসে বললেন—"I have never regarded Politics as a career — for me it is a way of life" — রাজনীতি আমার জীবিকা নয়, পেশা নয় – এ আমার জীবন, জীবনদর্শন। ছোটবেলা থেকে 'আনন্দভবনে' এলাহাবাদে, এর প্রভাব উনি অনুভব করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় 'আনন্দভবন' যেন সংগমের মত তীর্থস্থান ছিল। ভারতের চারকোনা থেকে সবাই জড় হত সেখানে। বিদেশ থেকেও আসতেন শিল্পীরা, লেখকরা, সব বাবা জওহরলাল আর ঠাকুরদা মতিলাল নেহরুর বন্ধুস্থানীয়। পূর্ব আর পশ্চিমের এই অপরূপ সমাগমের মাঝে ইন্দিরা বড় হয়েছেন, এই দুইয়ের প্রভাব তাঁর চরিত্রে গভীর রেখাপাত করেছে, কিন্তু ভারসাম্যতা বজায় রেখে। তাই ইন্দিরা বলেন – "You have to be a good Indian first before you could be a good universal citizen or an Internationalist" — নিজেকে ভারতীয় ডাকবার সৌভাগ্য অর্জন করো, তারপর বিশ্ব নাগরিকত্বে অধিকার জন্মাবে।

রাজনীতির কূটনীতির ফাঁকে ফাঁকে বিশ্ব নেতাদের সংগে আদানপ্রদান কতটা হয় ব্যক্তিগতভাবে? NAM এবং CHOGM-এর দৌলতে আজ শ্রীমতী গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান পেয়েছেন। এইসব সম্মেলনের কর্মসূচীর বাইরে বিরতির কথা উল্লেখ করে শ্রীমতী গান্ধী বললেন, বিশ্রামের সময় অনেক রকম আলোচনা করার সুযোগ আসে কারণ মন আয়েসী এবং প্রসন্ন থাকে। বন্ধুত্ব গভীর হয়, একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতীতে সমুদ্রযাত্রা

জাহাজে ছিল অনেক আরামদায়ক। এখন উড়োজাহাজে সবই যেন তড়িঘড়ি। নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। সকলকারই ব্যস্ততা বেড়ে গেছে এই জেটের যুগে।

পূজার ছুটিতে বেড়াতে না গেলে বাড়ির মেয়েদের মুখ ভার হয়, ছেলে মেয়েরা নিরাশ হয়। বলে, "বছরে একটা দিনও কি ছুটি পাব না? আনন্দ করতে পারব না?" অনেকেই বোধহয় জানেন না শ্রীমতী গান্ধীর কিন্তু কোন ছুটি নেই।

যদিও তিনি খুব পছন্দ করেন পাহাড়ে চড়তে (ছোটবেলায় অনেক ট্রেকিং করেছেন) পাহাড় তাঁকে আকর্ষণ করে সমুদ্রের থেকেও বেশি। কিন্তু পার্বত্য শহরে গিয়েও তাঁর রেহাই নেই। স্থানীয় লোকরা দর্শনের আশায় আসেন; আসেন তাঁদের সমস্যার সমাধানের জন্য। তাই একাকিত্বে বিশ্রামের সুযোগ মেলে না। সম্প্রতি তিনি লাদাকে গিয়েছিলেন সরকারি কাজে – তবু তাঁর প্রচুর বিশ্রাম হয়েছে সেখানে কারণ তিনি বলেন – "I think vacation is also in the mind" – মনের বিশ্রামই আসল ছুটি। অবসর বিনোদনের জন্য শিল্পকলা প্রদর্শনীতে যেতে ভালবাসেন – সে পিকাসো বা হুসেন, যাঁরই হোক। থিয়েটার অপেরা দেখতে সাধ যায়, কিন্তু সময় কোথায়? তবে অবসর একটু পেলেই তিনি বই নিয়ে বসেন।

কিশোরী ইন্দিরার 'বানর সেনা'র অধ্যায় অনেকের জানা আছে, কিন্তু তাঁর নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযান কজন জানেন? শৈশবে ইন্দিরা বাড়িতে কাজের লোকদের ছেলেমেয়েকে অ, আ, ক, খ, শেখাতেন – আশেপাশের গরিব বাচ্চাদের জড় করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতেন। আমাদের দেশে মহিলারা যদি ব্যাপকভাবে এরকম শিক্ষার আলো ছড়াতে পারেন তাহলে স্ত্রী নিরক্ষরতা অনেক দূর হবে। এই কারণেই শ্রীমতী গান্ধী 'সুকন্যা'কে অভিনন্দন জানান সাক্ষাৎকার দিয়ে। কারণ মেয়েদের পত্রিকা, বই ইত্যাদি পড়ার জন্য বিশেষ অনুপ্রেরণা দেওয়া প্রয়োজন। একান্তভাবে তাদের জন্য প্রকাশিত হলে স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের মধ্যে উৎসাহ জাগবে পড়বার।

দিনে প্রায় ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা যে মহিলা পরিশ্রম করেন, তিনি নিজেকে এত সুস্থ আর ছিমছাম কি করে রাখেন? কি তার

মনের বিশ্রামই আসল ছুটি।

রহস্য? সুকন্যাকে তিনি জানালেন, শৈশবকাল থেকেই তিনি ট্রেনিং পেয়েছেন এতে, বাড়িতে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্কুলে। ক্লান্তির ছাপ সহজে দেখা যায় না তাঁর মুখে, সেই প্রসংগে বললেন – "I think it is more a mental attitude if you think it is a drudge, then you get tired but if you think you are doing something worth while, then you don't" অর্থাৎ কাজে সন্তোষ থাকলে ক্লান্তি আসে না সহজে। কারণ মন পরিতৃপ্ত থাকে। শরীরের সংগে মনের গভীর যোগাযোগ, তাই শরীরও অসুস্থ হয় না। বিভিন্ন স্কুলে তিনি grooming অর্থাৎ পোশাকে ছিমছাম থাকার শিক্ষাও পেয়েছেন। সকালে বাড়ি থেকে বেরোবার আগে সারাদিনের কথা চিন্তা করে, সেইমত পোশাক পরেন যাতে কোনখানে সে বেশ বেমানান না হয়।

আজ যেমন তিনি পরেছেন সুন্দর একটি সুতির ছাপা শাড়ি – বাদামী রঙের উপর খয়েরী এবং জাম রঙের ছোট বুটি। হালকা বাদামী রঙের ম্যাচ করা ব্লাউজ। গলায় একটি রঙিন মালা – এছাড়া সম্পূর্ণ নিরাভরণ। কি অনাড়ম্বর অথচ কি সুন্দর। এই বেশেই ওঁর রাত পর্যন্ত কাটবে। কোন জায়গায় অশোভন হবে না। কারণ উনি বলেন – "I have learnt from the beginning that you must be dressed right for what you are doing" — কাজের উপযুক্ত পোশাক পরে বের হলে কোথাও সংকুচিত হতে হয় না। গোয়াতে NAM-এর বিরতির সময় লক্ষ্য করুন যেমন উনি লৌকিকতা না করে নিজের রাজ্যের নেটিভ পোশাক 'ফিরন' পরেছেন – কাশ্মীরে মেয়েরা এই ঢিলেঢালা কুর্তা পরে থাকেন; তার তলায় যাতে পেটের কাছে জলন্ত অংগার রাখা ছোট ধুনুচির মত পাত্র লাগিয়ে রাখতে পারেন প্রচণ্ড শীতের সময়। আগুন পোহাবার একটি বহু পুরনো পদ্ধতি।

১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন।

দেশে বিদেশে নানা অনুষ্ঠানের জন্য নানান ধরনের শাড়ি জামা জুতার প্রয়োজন হয়। এত ব্যস্ত সময় তালিকার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কেনাকাটার সময় হয় কি? তাঁর অনবদ্য শাড়ির নির্বাচনে যে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সকলেরই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'সুকন্যা'র পাঠিকারা জেনে খুশি হবেন, মডার্ন শাশুড়িরাও ছেলের বউয়ের সুনাম করে থাকেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পুত্রবধূর রুচির ভূয়সী প্রশংসা করে জানালেন, সোনিয়াই তাঁর জামাকাপড় গোড়াতে বাছাই করেন এবং পরে শেষ পছন্দ শ্রীমতী গান্ধী করেন। সোনিয়া ভারতীয় টেকসটাইল সম্বন্ধে খুবই ওয়াকিবহাল এবং সাবেকী আমলের ডিজাইন দুজনেরই ভাল লাগে তাই পছন্দের অমিল হয় না। বিদেশ যাত্রাকালে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা শাড়ি জামা বাছাই করে একটা list বানানো হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী তিনি তৈরি হন বলে অতি অল্প সময় তাঁর লাগে।

কাজে সন্তোষ থাকলে ক্লান্তি আসে না সহজে। কারণ মন পরিতৃপ্ত থাকে।

সারদাপ্রসাদজী এখানে টিপ্পনী কাটলেন যে কোন পুরুষকে নাকি উনি হারিয়ে দিতে পারেন নির্দিষ্ট সময়ের আগে তৈরি হয়ে। পুরুষ মানুষের উল্লেখে ইন্দিরাজী একটু নড়েচড়ে বসে হেসে উঠলেন – অকস্মাৎ তাঁর একটা হাসির ব্যাপার মনে পড়ে গেছে। অনেকের হয়তো ধারণা, শুধু মহিলারাই মেক আপ করেন এবং সে বিষয়ে সচেতন হন! এবার শুনুন শ্রীমতী গান্ধীর 'মেক আপ বনাম পুরুষ' সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা। আমেরিকা সফরের সময় টেলিভিশনে হাজির হবার জন্য ওঁকে মেক আপ দিতে এলে উনি আপত্তি জানালেন। সাধারণত যখন উনি কোনরকম রং লাগান না, তখন প্রয়োজন কি? টেলিভিশনের কর্মকর্তারা অবাক হলেন এক মহিলার মেক আপে অরুচি দেখে। তাঁরা উল্লেখ করলেন বিশেষ বিশেষ ভি আই পির নাম, যাঁরা নিখুঁত মেক আপের জন্য সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন – ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা ধৈর্য ধরে বসে থাকেন মেক

আপ করাবার জন্য। এখানে উল্লেখ্য, এঁরা সকলেই পুরুষ। কলহাস্যের মধ্যে দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী বললেন – "নাম কিন্তু আমি কারুর বলব না, কারণ এঁরা সকলেই বিশ্ববিখ্যাত।"

যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? এখানেও তার ব্যতিক্রম। বাইরের এত কাজ সত্ত্বেও ইন্দিরাজী প্রতিদিন সকালে সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনের তদারক করেন। রান্নার মেনু বলে দেন। অতিথি নিমন্ত্রিত হলে টেবিল সাজানোর নির্দেশ দেন – ফুলদানিতে ফুল ঠিক মত মানাচ্ছে কিনা, তাও দেখবার ফুরসত থাকে তাঁর। মরশুমি ফুলের চারা বাগানে কোথায় কোনটা লাগানো হবে, মালীকে তার নির্দেশ দেন। এছাড়া, বিদেশী অতিথিদের (সরকারি) জন্য সরকারি ডিনার থাকলে তারও খাবারের তালিকা ইত্যাদি নিজে তদারক করেন।

দেশ বিদেশের নানা উপাদেয় রান্না সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হল কোন দেশী বা বিদেশী ব্যঞ্জন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, তিনি জবাব দিলেন – "I like anything which is well cooked, I like rice and fish so that I fit in very well in Bengal from that point of view" – যে কোন পদ যা যত্ন সহকারে রান্না করা হয়েছে – বিশেষ করে ভাত এবং মাছ আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাই তোমাদের পশ্চিমবঙ্গে গেলে আমার কোন অসুবিধা হয় না।" অতিরিক্ত মশলা তাঁর সহ্য হয় না। তাই হালকা বাঙালী রান্না তাঁর সয় কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের ভারী মশলার রান্না তিনি বাগ মানাতে পারেন না। এই কথা বলে তিনি সারদাপ্রসাদজীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বলা বাহুল্য সারদা-প্রসাদজী অন্ধ্রের লোক।

আধুনিক ঠাকুমারা নাতি নাতনীদের কি গল্প শোনান? ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী? সুয়োরানী দুয়োরানীর রূপকথা? জানা গেল বর্তমান যুগে ঠাকুমার ঝুলির গল্প অচল। আজকালকার নাতিনাতনীরা অত্যন্ত সেয়ানা – তারাই উল্টে ঠাকুমাদের কাহিনী শোনায়। কারণ যে চাঁদমামা আগে ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল, সেখানে যাওয়া শিগগিরই ডালভাত হয়ে যাবে। আর মডার্ন বাবা মায়েরাও খুব সাবধান – দাদু ঠাকুমাদের মোটে সুযোগ দেন না নাতিনাতনীদের আদর দিয়ে মাথা খাবার। শ্রীমতী গান্ধীরও সে সুযোগ

ভাত এবং মাছ আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাই পশ্চিমবঙ্গে গেলে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

আসেনি – তবে তিনি নাতিনাতনীদের সাহচর্য যথেষ্ট পান। বিদেশযাত্রাতেও তাদের নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে – কিনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া ইত্যাদি জায়গায়। নাতনী প্রিয়াঙ্কা নাকি কিনিয়ার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে নিয়েছিল, হাস্যোচ্ছলে তিনি জানালেন। রূপকথার মনগড়া গল্পের বদলে তাঁর নাতিনাতনীরা শুনতে চায় তাদের বাবার ছোটবেলাকার কাহিনী – কি করত, কোথায় যেত ইত্যাদি। শুনে আমার মনে হল আমার মেয়েও কিন্তু তার ঠাকুমাকে একই প্রশ্ন করে থাকে! যুগের হাওয়া কত বদলেছে!

বাংলার মাটি, বাংলার জলের যে স্বাদ পেয়েছে, বাংলা মায়ের মেয়েদের আকর্ষণ কি সে অনুভব করেনি? শ্রীমতী গান্ধীও তার ব্যতিক্রম নন। শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হয় বটে কিন্তু আসল পরিচয় তাঁর ঘটেছিল বহু পূর্বে। সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা প্রমুখ কংগ্রেসের নামকরা নেত্রী বাল্যকালে আনন্দভবনে যাতায়াত করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন নেহরু পরিবারের সঙ্গে। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে নন্দলাল বসু তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। কিন্তু মা কমলা নেহরুর প্রভাবেই শ্রীমতী গান্ধীর বাঙালী মেয়ের কর্মদক্ষতায় শ্রদ্ধা জন্মে। কমলা নেহরু ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিতা। নারীমুক্তি আন্দোলনের গোড়ার দিকে যখন সমাজের উচ্চবিত্ত স্তরের শিক্ষিত মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক

মা কমলা নেহরুর প্রভাবেই শ্রীমতী গান্ধীর বাঙালী মেয়ের কর্মদক্ষতায় শ্রদ্ধা জন্মে। মা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনে দীক্ষিতা।

অগ্রগণ্যা ছিলেন বাংলার মেয়েরা। তাঁরা রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। গোঁড়া সনাতনী পরিবারের মেয়ে হয়েও কমলা নেহরু সেটা উপলব্ধি করেছিলেন এবং নারী জাগরণের সপক্ষে ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী বলেন – "My mother was a strong feminist and she felt that Bengali women had contributed a great deal to better opportunities for women" আমার মা ছিলেন নারী অধিকারের শক্ত সমর্থক। তাঁর মতে নারী প্রগতির ক্রমোন্নতিতে বাঙালী মেয়ের অবদান প্রচুর।

মা যদি শক্ত ফেমিনিস্ট ছিলেন, কন্যাও কি তাহলে সেভাবে প্রভাবিত হয়েছেন? ইন্দিরাজী হেসে জবাব দিলেন, জগৎ যে বিকৃতভাবে ফেমিনিস্টদের তুলে ধরেছে, উনি সেই অর্থে নন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ওঁর মতামত খুবই গভীর। সভ্যতার আদি যুগে যখন দৈহিক শক্তিরই জয় ছিল, তখন সত্যি মেয়েদের পিছিয়ে থাকার কারণ ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে অন্য ধরনের শক্তি এবং কর্মদক্ষতার প্রয়োজন। এ যুগের মেয়েরা তাতে বিলক্ষণ পারদর্শী। তাহলে তাদের সমান সুযোগ কেন দেওয়া হবে না? তিনি বলেন—"Every individual has got feminine qualities as well as masculine. It depends on the proportion" – প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রের দুটো দিক থাকে – একটি পুরুষসুলভ, অন্যটি নারীসুলভ। অনুপাতে যে গুণ বেশি থাকে, তারই প্রভাব সমাজে পড়ে – অর্থাৎ পুরুষসুলভ গুণ যুদ্ধ বিগ্রহের দিকে ঠেলে দেয়। তাই সমাজ যদি উন্নতি করতে চায় বাস্তবে, বুদ্ধিমত্তায় এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে (materially, intellectually and spiritually), তাহলে মেয়েদের বাদ দেওয়া চলবে না। পুরুষ ও নারীর দুজনেরই অবদান থাকবে সমান এতে। এ পর্যন্ত বলে শ্রীমতী গান্ধী একথার উপর জোর দিলেন – "I am not a feminist in the sense that I would like to down the men in any way. I think we need a spirit of partnership" – আমি পুরুষদের নিচু করে মেয়েদের ওঠাতে চাই না – আমাদের এখন প্রয়োজন সহযোগিতার ভাব, মৈত্রীর ভাব।

ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিতা, দেশের

সেরা মহিলার সম্বন্ধে যখন মন্তব্য করা হয় – "You are the only man in your cabinet?" তখন শ্রীমতী গান্ধীর কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয়? পুরুষ মহলে এটা প্রশংসাসূচক ধরা হয়। শ্রীমতী গান্ধী কিভাবে গ্রহণ করেন এই তোষামোদ? 'সুকন্যা'কে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন এই মন্তব্যে সমগ্র নারী জাতিরই অপমান। নারীকে পুরুষ বললে তাকে জাতে তোলা হয়, এ ভ্রম যেন আমাদের না হয়। কোন কাজের উপর নারী বা পুরুষের ছাপ মারা থাকে না – কোনটা কারো একচেটিয়া নয়।

আমাদের দেশে নারী জাগরণের আন্দোলনে আমরা তো পুরুষকে বাদ দিতে চাইনি? আমাদের যুদ্ধ কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় – সমান অধিকারের সপক্ষে। এখানেই আমেরিকার নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের তফাত। পুরুষের সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই উপরন্তু তাদের সঙ্গে আমরা হাত মিলিয়ে চলতে চাই। যেমনভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম পুরুষের সঙ্গে,

আমি পুরুষদের নিচু করে মেয়েদের ওঠাতে চাই না – আমাদের এখন প্রয়োজন সহযোগিতার ভাব, মৈত্রীর ভাব।

সেইভাবে সমাজের অন্যায়, অবিচার আমরা একসাথেই লড়াই করে দূর করব। অতীতে দেশে, বিপদের সন্ধিক্ষণে বার বার কি মেয়েরা সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়ে প্রমাণ করেননি যে, পুরুষের মত তাঁরাও কঠিন ব্রতে সফল হতে পারেন? তাতে কি তাঁদের কোনভাবে নারীত্ব হানি হয়েছে?

দূরদর্শনের সাক্ষাৎকারে আপনারা বোধকরি লক্ষ্য করে থাকবেন বিদেশী সাংবাদিকদের অনেক আপত্তিকর প্রশ্নে, শ্রীমতী গান্ধী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, হাসিমুখে অপ্রত্যাশিত কোন জবাব দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে কৌতূহল বহুদিনের তাই দ্বিধা কাটিয়ে জিজ্ঞাসা করে ফেললাম এবং এও বললাম যে আমরা খুব খুশি যে উনি কথার জাদুতে ওদের জব্দ করে দেন। শ্রীমতী গান্ধী হেসে বললেন – "In many places there is such anti-Indian propaganda; so one has to put the record straight" – অনেক সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে এত মিথ্যা নিন্দা প্রচার হয় যে, আপত্তি না জানিয়ে উপায় থাকে না – যেমন বিদেশে থেকে থেকেই রব ওঠে, এমনকি বইতেও ছাপা হয় যে ইন্ডিয়া নাকি পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে অমুক সালের অমুক তারিখে! অথচ আজ পর্যন্ত শান্তিকামী ভারতবর্ষ কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেনি! কাজেই শ্রীমতী গান্ধীকে বাধ্য হয়ে সাংবাদিকদের উচিত জবাব দিয়ে চুপ করাতে হয়। কারণ উনি জানেন, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা অন্যের প্ররোচনায় এসব প্রশ্ন করে থাকে! তাই মুহূর্তের মধ্যে সেটা যাচাই করে নেবার ক্ষমতা তাঁর আছে। রসবোধ না থাকলে এটা সম্ভব

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের সঙ্গে



হয় না।

পরিশেষে অনুরোধ জানালাম 'সুকন্যা'র পাঠিকাদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে। তিনি বললেন – নতুন করে আর কি বলব? "Today, women all over, regardless of party, ideology class and relegion, are taking interest in wider problems and we would like our women also to do that" – পৃথিবী জোড়া মেয়েরা আজ, স্থান কাল, পার্টি, ধর্ম নির্বিশেষে চোখ মেলে তাকাচ্ছে – নিজের স্বার্থ ভুলে দশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমি চাই, আমাদের মেয়েরাও জাগৃক, তাই করুক।

জীবনদর্শন সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটি বর্ণনা দিলেন – "The Indian philosophy always has been to took at life as a whole, and not to cut up into bits" – আমাদের জাতীয় জীবনদর্শন শেখায় জীবনকে পূর্ণাঙ্গ করে দেখতে – ছোট ছোট টুকরোর মাধ্যমে নয়। তাই ধর্মের নামে শুধু মন্দির, মসজিদ, গুরুদোয়ারা ও গির্জাতে বসে উপাসনা করলেই সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে না। মনটাকে শুদ্ধ করতে হবে – তথাকথিত ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের কাজে, দশের কাজে নিজেকে বিলিয়ে, জীবন সার্থক করতে হবে।

শুধু মন্দির, মসজিদ, গুরুদোয়ারা ও গির্জায় বসে উপাসনা করলেই সব পাপ ধুয়ে মুছে যাবে না। মনটাকে শুদ্ধ করতে হবে ……

আজকের দুনিয়াতে ইন্দিরা গান্ধী একটি নাম যার মোকাবিলা করতে অনেকেই ভয় পান। সেখানে 'সুকন্যা'র প্রতিনিধি কোন সাহসে এত রকমারি প্রশ্ন করে ফেলল? সত্যি কথা বলতে কি, তিনি আমার কোন প্রশ্ন এড়িয়ে যাননি, বা কোন প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে ধমকের সুরে উত্তর দেননি। বরং আশাতীতভাবে প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসার সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন যা প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকেও অবাক করেছে। কখনো সিরিয়াস, কখনো হালকা, হাসিগল্পের মধ্য দিয়ে কোথা দিয়ে যে চল্লিশ মিনিট কেটে গেল টেরই পেলাম না অথচ সাধারণত শ্রীমতী গান্ধী নাকি দশ থেকে পনের মিনিটের বেশি সাক্ষাৎকার দেন না। একে যেন ঠিক সাক্ষাৎকার বলা চলে না – বরং বলব মহিলামহলের ঘরোয়া বৈঠকে, আমাদের দেশের নারীদের সমস্যা নিয়ে তিনি খোলাখুলি আলোচনা করলেন। এ আমার জীবনে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।

শস্যক্ষেত পরিচর্যায় ইন্দিরাজী



ইন্দিরা ঃ কোমলে কঠোরে এক চিরন্তন নারী

পার্থ চট্টোপাধ্যায়



১৯৬৪ সালের ২ জুলাই। টেলিপ্রিন্টারে খবর এল লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর মন্ত্রিসভায় জওহরলাল নেহরুর মেয়ে ইন্দিরাকে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী করেছেন। এ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। শুধু বিরোধীরা কটাক্ষ করলেন। ইন্দিরা গান্ধীর মত একজন নভিসকে বেতার ও তথ্য দফতরের মত গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হল! দেশে আর কি লোক ছিল না? ইন্দিরা তখন পার্লামেন্টের সদস্য পর্যন্ত নন। সবজান্তা সাংবাদিকরা মুচকি হেসে বলল ঃ নেহরু তো মৃত্যুর আগে লালবাহাদুরকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, ইন্দুকে দেখো। নেহরুর জীবদ্দশায় সমালোচনা উঠেছিল, নেহরুর মনোগত ইচ্ছা, বংশগত শাসন প্রতিষ্ঠা করা। নিজের মেয়েকে তিনি রাজনীতিতে টেনে এনেছেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস সভানেত্রী করেছেন। ১৯৫৮ সালের ২ ফেবরুয়ারি ইন্দিরা কংগ্রেস সভানেত্রী নির্বাচিত হন। সে সময় কংগ্রেস সভাপতির পদ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওয়ারকিং কমিটিতে বিরাট বিরাট নেতারা ছিলেন। ইন্দিরার বয়স তখন ৪১ বছর মাত্র। রাজীব গান্ধী যে বয়সে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন ঠিক ওঁর কাছাকাছি বয়সে ইন্দিরা কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন। প্রবীণ নেতারা মনে মনে খুব চটলেন। ইন্দিরা আবার ঝাঁঝালো গোষ্ঠীর নেত্রী। প্রবীণের শাসন নাশনই ওই গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁরা মুখে বেশি কিছু বলতে পারলেন না। জওহরলালের মুখের ওপর কথা বলার সাধ্য কারও ছিল না।

১৯৬৪ অথবা ১৯৬৫ সালের গোড়ায়, তারিখটা আমার মনে পড়ছে না, ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা প্রেস ক্লাবে আসেন। সেই প্রথম আমি তাঁকে দেখলাম। উনি চিরকালই রূপবতী। কিন্তু সেই সময় যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরা জানেন, রূপ যেন ফেটে পড়ত তাঁর। মুখে হাসিটি লেগে আছে। গলার স্বরটি একেবারে কুড়ি-একুশ বছরের তরুণীর মত। ওই গলার স্বর তাঁর কখনও পালটায়নি।

প্রেস ক্লাবে একটা ঘরোয়া আলোচনা হল। সে সময় তাঁর পিছনে জনতা অমন করে ছুটত না। কাজেই তাঁর কলকাতায় আসা নিয়ে হইচই হয়নি। তখন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দেশে টিভি খোলা হবে। খবরের কাগজ তো এই সিদ্ধান্তে চটে লাল। বিরোধীরাও চটে লাল। খবরের কাগজের আশংকা টিভি এলে কাগজের বিজ্ঞাপন কমবে। বিরোধীদের বক্তব্য ঃ যে দেশের লোক খেতে পায় না, সে দেশে আবার টিভির বিলাসিতা কেন? আমরা ইন্দিরাকে চেপে ধরলাম। টিভি চালু করে আপনি কি অত্যন্ত অন্যায় করছেন না?

উনি বললেন ঃ মোটেই নয়, বরং এতে লোকের উপকার হবে। সাধারণ মানুষ অনেক কিছু জানবে, জ্ঞান বাড়বে। জ্ঞানই শক্তি। নলেজ ইজ পাওয়ার।

আমরা বললাম ঃ ভুলে যাবেন না, এদেশে এখনও অসংখ্য গ্রামে নলকূপ নেই। আগে টিভি না আগে টিউবওয়েল?

উনি বলেছিলেন, দুটোই সমান দরকারী। দুটোই উন্নয়নের কাজ।

ইন্দিরাজী বসে চা খেলেন। ওঁর পায়ে অন্য জুতো ছিল। উনি ওঁর একজন লোককে বললেন ঃ মেরি জুতি লে-আও। উর্দিপরা ওঁর অনুচর তাড়াতাড়ি একটি সুন্দর শ্লিপার নিয়ে এলো। সেই জুতো পরে মিষ্টি হেসে তিনি সবাইকে নমস্কার করে গাড়িতে উঠলেন।

এই অভিজাত বিদেশে শিক্ষিত ধনী পরিবারের মা মরা আদুরে মেয়ে যে একদিন গরীবের নেত্রী হয়ে উঠবেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি।

কিন্তু দু বছরের মধ্যে ইন্দিরা একেবারে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন। তখন তিনি লোকসভার সদস্যাও নন। শুধু রাজ্যসভার সদস্যা। বয়স ৪৮ বছর ৩ মাস। এবারে কিন্তু কেউ তাঁকে বসিয়ে দিল না। বেশ লড়ে প্রধানমন্ত্রী হতে হল। প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার মোরারজী দেশাই স্বয়ং। তিনি ঝানু রাজনীতিবিদ। তিনি যে অযোগ্য তাও কেউ বলবে না। ইন্দিরা তাঁর মেয়ের বয়সী। কিন্তু মোরারজীর একটা ইমেজ ছিল, তিনি প্রগতি বিরোধী, ভীষণ গোঁড়া, একরোখা। ইন্দিরার ইমেজ তৈরি হয়ে গেছে, তিনি প্রগতিশীল। সংসদীয় দলের ভোটে ইন্দিরাই জিতে গেলেন। সে সময় প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী-দেরও ডাকা হয়েছিল মতামত দেবার জন্য। বেশ মনে আছে প্রফুল্লবাবু আমাদের বলেছিলেন, আমি ইন্দিরাকে ভোট দিয়েছি। ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য প্রার্থী।

১৯৬৬ সালের ২৪ জানুয়ারি ইন্দিরা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন।

এরপর ইন্দিরা একের পর এক কান্ড ঘটিয়েছেন, যা ইতিহাসে তাঁকে অমর করে রেখেছে। যেমন ১৯৬৭ সালে তিনি লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়ালেন রায়বেরিলী থেকে। বিপুল ভোটে জিতলেন। এর পরে ১৯৬৯ সালের ১৯

জুলাই ব্যাংক জাতীয়করণ করে নিলেন। ঘটনাটি যত সহজ এখন মনে হচ্ছে তত সহজ ছিল না। দলের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা ছিল। মোরারজী তো একেবারে বেঁকে বসলেন। তাঁর সংগে ইন্দিরার মতান্তর চরমে উঠেছে। অবশেষে মোরারজী পদত্যাগ করলেন।

এরপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের সংগে তাঁর বিরোধ বাধল। রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেসের অফিসিয়াল প্রার্থী ছিলেন সঞ্জীব রেড্ডী। ভি ভি গিরিকে সমর্থন করছিলেন বিরোধীরা। ইন্দিরা গিরিকে চান। তিনি দলের সবাইকে বললেন, আপনারা বিবেকের নির্দেশে যাকে যোগ্য মনে করবেন তাকে ভোট দেবেন। গিরি জিতে গেলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলে ভাঙন দেখা দিল। ইন্দিরা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। কিন্তু কে কাকে বহিষ্কার করে। দেখা গেল সংসদের অধিকাংশ কংগ্রেস এম পি ইন্দিরার দিকে। ইন্দিরা বললেন, তিনিই প্রকৃত কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের লোকে নাম দিল নব কংগ্রেস। যাঁরা ইন্দিরাকে সমর্থন করলেন না, তাঁরা থাকলেন আদি কংগ্রেসে – পরবর্তীকালে যার নাম হয়েছিল সংগঠন কংগ্রেস, আরও পরে আরস কংগ্রেস। ইন্দিরার নব কংগ্রেস শেষমেষ ইন্দিরা কংগ্রেস বলে পরিচিত হল।

ইন্দিরার ভাগ্য এমন, যত বিরোধিতা তত তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি। যত বিপর্যয় ততই তাঁর গৌরব বৃদ্ধি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন তো খুব দুঃখের। ১৯ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছেন। ৪৩ বছরে বিধবা হয়েছেন। ১৮ বছরের বিবাহিত জীবনে সংসার সুখও বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ইন্দিরা বাবার কাছেই বেশি থাকতেন। বাবাকে হারালেন বিধবা হওয়ার ঠিক চার বছরের মাথায়। তখন তিনি একেবারে একা।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাকে আমি সাংবাদিক হিসাবে ধাপে ধাপে দেখেছি। প্রতিদিনই যেন তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন। ভাল বক্তৃতা দেবার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছেন। বক্তৃতা দিতেন জওহরলাল নেহরুর মত ধীরে ধীরে। প্রবল একটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ইন্দিরার জনপ্রিয়তাকে বাড়িয়ে তুলল। একে একে জীবনবীমার জাতীয়করণ, বাংলাদেশ সৃষ্টি, সিকিমের ভারত ভুক্তি, আরও অনেক কাজ করলেন। ১৯৬৭ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার নানা অনুষ্ঠান কভার করেছি। বহু সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করেছি।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের পর ইন্দিরা ঢাকা গেলেন। আমি তখন ঢাকায়। রমনার মাঠে শেখ মুজিব আর ইন্দিরা ঐতিহাসিক সভা করলেন। কয়েক লক্ষ লোক এসেছিল সেই সভায়। শ্রীমতী গান্ধীকে দেখে বাংলাদেশের মানুষরা ভীষণভাবে অভিভূত। আমাকে অনেকে বললেন : 'এলিগেনট লেডি।' কথাটা এখনও কানে বাজছে। ঢাকার গভরনর হাউসে শ্রীমতী গান্ধীর সংগে দেখা করেছিলাম। পরিচয় দিয়েছিলাম ভারতীয় সাংবাদিক। ইন্ডিয়ান আরমির সংগে এসেছিলাম। সেই থেকে আছি।

উনি বললেন : কি রকম অবস্থা দেখছ?

বলেছিলাম, ধীরে ধীরে আইনশৃংখলা ফিরে আসছে। তবে কিছু কিছু লোক ভারত বিরোধী মনোভাব ছড়াচ্ছে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, আমাদের খুব সতর্কভাবে চলতে হবে। বাংলাদেশের মানুষের মর্যাদায় লাগে এমন কোন কাজ যেন কেউ আমরা না করি। বড় রাষ্ট্রের পাশে একটা ছোট রাষ্ট্র থাকলে তাদের মনে অনেক অমূলক ধারণা হতে পারে। এটা স্বাভাবিক ঘটনা।

একটা ইনসারজেন্সি ঘটানো এমন কিছু বড় কথা নয় – কিন্তু বিশ্বজনমত যোগাড় করা বেশ শক্ত ব্যাপার। বাংলাদেশের পিছনে গোটা বিশ্ব যে এসে দাঁড়াল সেটা শ্রীমতী গান্ধীরই কৃতিত্ব। আমি সামরিক বাহিনীর জয়কেও এর তুলনায় বড় বলে মনে করি না। তখন সারা বিশ্ব জুড়ে শ্রীমতী গান্ধীর নাম। একটা রাষ্ট্র তৈরি করে দিলেন একজন ভিন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাছাড়া এই বাংলাদেশ গঠনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়ে গেল, দ্বিজাতি তত্ত্ব ব্যাপারটা একটা বিরাট ধাপ্পা। হিন্দু-মুসলমান যদি আলাদা জাতি হবে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেল কেন? জিন্নার ওই ভ্রান্ত নীতির প্রতিশোধ ইন্দিরা ছাড়া আর কেউ নিতে পারেননি।

ঢাকায় আমরা শ্রীমতী গান্ধীর সংগে স্টিমারে করে নদীতে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। প্রায় সারা দিনের ভ্রমণ। ঘোরার সময় শ্রীমতী গান্ধীর খাশ ভৃত্যকে ধরে শ্রীমতী গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিলাম। তার কাছ থেকে জানলাম, শ্রীমতী গান্ধী ভোর চারটেয় উঠে খানিকক্ষণ ধ্যান করেন। তারপর যোগ ব্যায়াম করেন।

শ্রীমতী গান্ধীর প্রিয় জায়গা ছিল শান্তিনিকেতন। ওখানে গেলে তিনি প্রাক্তন ছাত্রীর মত আচরণ করতেন। বছর চারেক আগে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন বিশেষ সমাবর্তনে। সে সময় দেখলাম বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তাঁকে যত অটোগ্রাফে সই করতে বলছে তত অটোগ্রাফে সই করে দিচ্ছেন।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী হেরে গেলেন। হেরে যাওয়ার পর তাঁর অনেক সংগীসাথী সরে পড়ল। এমনকি যে সব খবরের কাগজ কাছাখুলে তাঁর প্রশংসা করত, তারাও তাঁর নানা কেচ্ছা ছাপতে লাগল। সে সময় তাঁকে গ্রেফতারও করা হল। জরুরী অবস্থা জারী করে যে ভুল করেছিলেন, তার মাশুল দিতে হল তাঁকে।

সে সময় তিনি পশ্চিমবংগে এলেন সঞ্জয়কে নিয়ে। দার্জিলিং-এ কাটালেন কিছুদিন। পশ্চিমবংগে তাঁর সেই দুঃসময়ে দেখেছিলাম বেশ কিছু কংগ্রেস নেতাকে তাঁর সংগে থাকতে। এদের মধ্যে সুব্রত মুখার্জি, হরষিত ঘোষ প্রমুখের কথা মনে পড়ছে। পারক হোটেলে প্রেস কনফারেনস ডেকেছিলেন ইন্দিরা। উনি এলেন। মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই, এত বিপর্যয় গেছে তাঁর। সেই রকম তেজ রয়েছে। তবে হাসিটা একটু ম্লান।

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম : দার্জিলিং যাচ্ছেন কেন?

উনি বলেছিলেন : আমার অ্যালার্জির ধাত। ধুলো লাগলে অ্যালার্জি হয়। তাই দার্জিলিং-এ গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নেব।

পরে শুনেছিলাম কোন একটা মামলার ব্যাপারে তিনি কিছুদিন পশ্চিমবংগে থাকা মনস্থ করেছিলেন।

আমার স্মৃতি খুব দুর্বল। নোট রাখার অভ্যাস নেই। তাই তাঁর কভারেজের সব ছবি স্মৃতিতে ধরা নেই। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি খুব কাটা কাটা জবাব দিতেন। প্রশ্ন পছন্দ না হলে রেগে যেতেন।

আমি কলকাতায় তাঁকে একবার প্রশ্ন করেছিলাম, চীনের সংগে আমরা গোলমাল মিটিয়ে নিচ্ছি না কেন?

উনি বলেছিলেন, আমি করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কেউ যদি হাতটা মুচড়ে দেয়, কি করতে পারি?

সেবার কলকাতা এ আই সি সি অধিবেশনে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন রাজীবের একটি ব্যাপারে। প্রশ্ন শুনে তিনি এমনভাবে ক্ষেপে গেলেন যে সবাই অপ্রস্তুত। নিউ ইয়রকে তাঁর সংগে গিয়েছি। এক সাংবাদিক বৈঠকে এক ভারতীয় সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, মিসেস গান্ধী, সব সভ্য দেশ রাশিয়ার কোরিয়ান বিমান গুলি করার প্রতিবাদ করেছে, অথচ আপনি করলেন না। ব্যাস, আর যাবি কোথায়?" শ্রীমতী গান্ধী প্রথম প্রশ্ন শুনেই চটে গেলেন। 'আগে বলুন সভ্য দেশ বলতে কি মনে করেন? কারা সভ্য?'

অবশ্য পরে রাগ জল হয়ে গেল। প্রেস কনফারেনসের পর স্থানীয় সাংবাদিকরা খাতা এগিয়ে দিতে লাগল, ম্যাডাম একটা অটোগ্রাফ। উনি বসে বসে সই করতে লাগলেন।

সাংবাদিকদের সংগে ওঁর ছিল খুবই খারাপ সম্পর্ক। বড় বড় সাংবাদিকরা সবাই ওঁর কট্টর সমালোচক। উনিও তাঁদের দেখতে পারেন না। আবার ছোট সাংবাদিকদেরও উনি পাত্তা দেন না। ওঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে পাত্তা পাওয়া বেশ কঠিন ছিল।

আমার সংগে ওঁর ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে ওঁর বিদেশ যাত্রার সময়। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটর অশোক চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে আমি আবেদন করে বসলাম তাঁর বিদেশ সফরের সংগী হবার। এর আগে রাজীব গান্ধীর একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তখন

তাঁর সংগে পরিচয় হয়। শ্রীমতী গান্ধীর প্রেস সেক্রেটারি সারদাপ্রসাদ আমাকে চিনতেন। তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ভগৎজীর কাছেও আবেদন করলাম। ভগৎজী আমার আবেদন নিয়ে গেলেন রাজীবজীর কাছে। ওদিকে প্রণব মুখোপাধ্যায়ও সুপারিশ করলেন। সারদা-প্রসাদজীরও আপত্তি নেই আমায় নিতে। এই ত্রিমুখী আক্রমণের ফলে আমি প্রধানমন্ত্রীর সফর সংগী মনোনীত হলাম। প্রধানমন্ত্রীর সফরে তাঁর নিজস্ব প্লেনে তাঁর সংগে বিদেশ ঘোরার সুযোগ – এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হলাম।

এই সফরে আমি ইন্দিরাজীকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। মাঝে মাঝে কথাবার্তাও হয়েছে। তবে তাঁকে একা পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। সাইপ্রাসের নিকোশিয়াতে প্রথম দিনের টি পারটিতে আমি নিজে ওঁর সামনে গিয়ে পরিচয় দিলাম।

উনি বললেন : তোমার কথা শুনেছি। তুমি এসেছ ভাল করেছ। এটা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা। তা তোমার ভাল লাগছে তো? Are you enjoying? আমি বলেছিলাম, নিশ্চয়ই। কয়েকটা জিনিস খুব চোখে পড়েছিল। যেমন পাংচুয়ালিটি। ঘড়ির কাঁটার মত সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রোগ্রাম। কোথাও একচুল লেট করেননি। দ্বিতীয়ত, বিদেশে ওঁর অসম্ভব জনপ্রিয়তা। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে বৃদ্ধরা পর্যন্ত সবাই ওঁকে দেখে অভিভূত। মনে আছে আথেনসে স্টেট রিশেপসনে বেশ মুশকিলে পড়েছিলাম। এক ইংরাজি জানা গ্রীক অধ্যাপক আমাকে ধরলেন, আমার ভীষণ ইচ্ছে মাদাম গান্ধীর সংগে কথা বলার। একটু আলাপ করিয়ে দিন না দাদা, চিরকৃতজ্ঞ থাকব। বার বার বলায় যা থাকে কপালে বলে তাঁকে নিয়ে হাজির করলাম শ্রীমতী গান্ধীর কাছে। বললাম, ইনি একজন গ্রীক বুদ্ধিজীবী। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সংগে করমর্দন করলেন।

পরদিন গিয়েছি মেট্রোপোলে ওপেন্ এয়ার গ্রীক থিয়েটার দেখতে। পাহাড়ের ওপরে থিয়েটার। চারিদিকে খোলা, কনকন করে হাওয়া বইছে। গায়ে গরম কোট চাপিয়ে ঠকঠক করে কাঁপছি। হঠাৎ দেখি শ্রীমতী গান্ধীর পারসোনাল আরদালি একটা ওভারকোট নিয়ে এসে আমায় জিজ্ঞাসা করছে, মাদাম কোথায় বলতে পারেন?

শ্রীমতী গান্ধী বসেছেন পিছনের দিকে। তিনি ওভারকোট আনেননি। শীতে আরও কষ্ট পাচ্ছেন। আরদালি তাই কোট নিয়ে এসেছে। আমি বললাম, ভেতরে দেখো। ওইদিকে বসে আছেন।

কিন্তু আরদালি খুঁজে পেল না। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শীতে টিকতে না পেরে আমি মাঝখানে হোটেলে ফিরে এলাম। শ্রীমতী গান্ধী ওই ঠান্ডায় বসে শেষ পর্যন্ত নাটক দেখলেন।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, পোশাকের ব্যাপারে খুব পারটিকুলার তিনি। যাকে বলে সাজগোজ, শাড়ি পোশাক ইত্যাদির প্রতি তাঁর বেশ ঝোঁক আছে। বিদেশ সফরের সময় কয়েক বাক্স শাড়ি আর পোশাক গেল। একটা শাড়ি তিনি কখনও দুবেলা পরতেন না। তাছাড়া পরিবেশের সংগে মিলিয়ে পোশাক পরতেন।

গ্রীসে অ্যাকরোপলিসে দেখলাম বেগুনি শালোয়ার কামিজ পরেছেন। পরদিন ডেলফিতে ঘুরবার সময় পরেছেন টিয়া রঙের শালোয়ার কামিজ। সব সময় ফিটফাট থাকতেন তিনি।

প্রণব মুখার্জির স্ত্রী শুভ্রা মুখার্জির কাছ থেকে শুনেছি, শুভ্রা দেবী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, দিদি আপনার ত্বক এত চকচকে থাকে কী করে? শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, আমি যে তেল মাখি রোজ। কি তেল? সরষের তেল? ইন্দিরা বলেছিলেন, সরষের তেল ছাড়া যে কোন তেল।

শ্রীমতী গান্ধীকে ডিনারে সামান্য খেতে দেখেছি। আমার সামনেই তিনি প্লেটে রাতের খাবার তুলে নিয়েছেন একটু স্যালাড, একটু মাছ, চায়ের সংগে একটা পেস্ট্রি।

শুভ্রা মুখার্জি বলেছিলেন, বাড়িতে উনি সামান্যই খান। সপ্তাহে একদিন নিরামিশ খান। আর একদিন উপোস করেন। মেয়েলি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। শুভ্রা দেবী একদিন উঁচু গলার ব্লাউজ পরেছিলেন। উনি এসে চুপি চুপি বলেছিলেন, উঁচু গলার ব্লাউজে তোমাকে মোটা দেখায়। তুমি ছোট গলার ব্লাউজ পর।

নিউইয়রক ছাড়ার আগে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল শ্রীমতী গান্ধীকে একটা ডিনার দিলেন। আমরাও আমন্ত্রিত। ওই ডিনারের আগে রিসেপশনে আবার শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এগিয়ে গেলাম।

বললাম, আপনার এবারের সফরে একেবারে হাঁফ ফেলার জায়গা নেই। শ্রীমতী গান্ধী এক টুকরো বাদাম মুখে পুরে বললেন, আমার তো মনে হয় এটা আমার যথেষ্ট হালকা ট্যুর।

আমি হেসে বললাম, আমার তো প্রথম অভিজ্ঞতা।

উনি হেসে বলেছিলেন, আসলে এই রকম দ্রুততার সংগেই সব কিছু চলে। তা তোমাদের তো ম্যাগাজিন, রোজই খবর পাঠাচ্ছ?

: রোজই কিছু কিছু পাঠাই। ম্যাগাজিন বলেই তো মুশকিল, ঝাড়াই বাছাই করতে হয়।

ফিরে এসে পরিবর্তনে ধারাবাহিক ভাবে লিখেছিলাম, 'ইন্দিরা গান্ধীর সংগে দেশে দেশে।' অনেকে প্রশংসা করলেন। বললেন, প্রধানমন্ত্রীর সংগে ভ্রমণের এমন অন্তরংগ কথা কোথাও পাইনি। কিন্তু আবার অনেকে ব্যংগ করতে শুরু করে দিলেন। চিত্তরঞ্জনের এজেনট এসে জানিয়ে গেলেন আপনার লেখার জন্য পরিবর্তনের সেল কমে গেছে মশাই।

কেন বলুন তো?

ইন্দিরা আনপপুলার। তাকে আপনি এমন আপ করেছেন। তারা বলছে আর পরিবর্তন পড়ব না। ইন্দিরার চামচাবাজি করছেন সম্পাদক।

আমি যা ঘটনা তাই লিখেছিলাম। কিন্তু ইন্দিরা পশ্চিমবংগে জনপ্রিয় কিনা আজ পাঠকেরা বিচার করে দেখুন।

পরিবর্তনে যখন লেখাগুলো বার হচ্ছে তখন কলকাতায় তিনি এলে রাজভবনে দেখা করলাম তাঁর সংগে। ভেবেছিলাম, আমাকে ভুলে গেছেন। নতুন করে নাম বলতে গেলাম। ইন্দিরাজী বললেন, আমার মেমারি এত খারাপ নয় যে তোমার নাম ভুলে যাব। বল কি খবর?

: আপনার সংগে ভ্রমণ নিয়ে ধারাবাহিক-ভাবে লিখছি।

: আমি তো পড়তে পারি না বাংলা।

: আমি ইংরাজি সিনপসিস এনেছি।

: দিয়ে যাও। বইটির যদি কখনও ইংরাজি করো ভাল করে পড়ব।

বললাম, ইচ্ছে আছে খুব। দেশের বর্তমান অবস্থায় একটা কিছু মেসেজ দিন।

বললেন, দেশের মধ্যে অনৈক্যের প্রবণতাকে রুখতে হবে। ভারতে ঐক্যবদ্ধ না থাকলে আমরা কেউ বাঁচব না।

আরও কিছু বলতেন। কিন্তু তখনকার রাজ্যপাল এ পি শর্মা একগাদা লোক নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি চলে এলাম।

'সাংবাদিকের দেশে দেশে' বলে আমার বইটি যখন বেরুলো, তখন তাঁর কাছে ফোরওয়ারড চাইলাম। দু সপ্তাহের মধ্যে নিজে সই করে ফোরওয়ারড পাঠিয়ে দিলেন। বইটি দিল্লিতে গিয়ে সারদাপ্রসাদকে দিয়ে এলাম। কথা ছিল ইংরাজি সংস্করণের তিনিই উদ্বোধন করবেন। ডিসেম্বরের গোড়ায় তারিখ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আর কোনদিনই তাঁকে পাব না।

আমার কাছে তিনি একজন প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন। আমি তাঁর রাজনৈতিক অনুগামী ছিলাম না। তাঁর অনুগ্রহ-ভাজনদের তালিকাতেও ছিলাম না। আমি ছিলাম একজন প্রধানমন্ত্রীর জীবন পর্যবেক্ষক। সামান্য যে পরিচয়টুকু হয়েছিল সেটি নেহাতই দৈববশে, উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু আমার সাংবাদিক বিচার বিশ্লেষণে তাঁকে আমার সব দিক দিয়ে এক ঐতিহাসিক চরিত্র বলে মনে হয়েছিল। তিনি ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি নানা দিক থেকে তাঁর পিতাকেও অতিক্রম করেছিলেন। তিনি ছিলেন নারীত্বের মূর্ত প্রতীক। কোমলে-কঠোরে, ঐশ্বর্যে-দীনতায়, উচ্ছ্বাসে-অভিমানে তিনি রক্তমাংসের নারীই ছিলেন।

ফটো : সন্দীপ সিংহ



শেষ সাক্ষাৎ

গত আগস্ট মাসে বেলুড় মঠে ভরত মহারাজের সংগে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ফটো : নিমাই ঘোষ

ইন্দিরা : ইতিহাসেরই মানসকন্যা

রানা দাস

জানি, মৃত্যু সর্বদাই সত্যি কথা বলে। এও জানি, একটি ঘুম ভাঙাতে সকাল কখনো দু'বার আসে না।

তবু, 'ইন্দিরা গান্ধী অমর' সান্ত্বনা ক্ষোভ ও বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু থেকে উচ্চারিত এই শ্লোগান – আজ সমর্থক বিরোধী জাতি ধর্ম বর্ণ ও বয়েস নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর একমাত্র উচ্চারণ। এই উচ্চারণ পরিকল্পিত নয়, কারো উসকানিতেও নয়, স্বতঃস্ফূর্ত।

ইন্দিরা হত্যাকান্ড ভারতীয় ইতিহাসে যতখানি কলংকে চিহ্নিত হবে, এই হত্যাকান্ডের প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে তার চাইতে অনেক বেশি গৌরবের স্মৃতি হয়ে থাকবে। মাত্র একটি প্রাণের কাছে, একটি নয়, দু'টি নয়, ষোলটি কিংবা সংখ্যাতীত বুলেটের হার এইখানেই। যাদের হিংসার প্রতিভূ এই বুলেট, সভ্য নির্ভীক মানবতার কাছে চরম লজ্জাকরজনক পরাজয় তাদেরও। জানি না এই গ্লানি তাদের স্পর্শ করবে কি না!

সন্দেহ এই কারণে, এমন ঘটনা নতুন কিছু নয়, এর আগেও ঘটেছে। তবু ভরসা, তাতে স্তম্ভিত হলেও সভ্যতা থমকে পড়ে না, কোনো কালেই পড়েনি। ইন্দিরা গান্ধীর অমরতা সেইখানেই। জীবনে মৃত্যু ঘটে সকলেরই, কিন্তু কেউ কেউ জীবন নিবেদন করেন, আমরা তাকে মৃত্যু বলি না, বলি, দান। এই দান কোনো বিশেষ জাতি বা বর্ণের জন্য নয়, এই দান সমগ্র মানুষের, জীবের কল্যাণে – যে কল্যাণ এই সভ্যতার ধারক ও বাহক। ইন্দিরার হত্যাকান্ড একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা মাত্র, কিন্তু কর্ম ও আদর্শের জন্যে ইন্দিরার জীবনপণ লড়াই পার্থিব জগতের চিরকালের পাথেয়।



কিশোরী ইন্দিরা : কমলা ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে

শৈশবে ইন্দিরা অনেকের কাছেই শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রসঙ্গত তাঁর একটি গানের কথা মনে পড়ছে – 'সন্ত্রাসের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান'। না, এই বিহ্বলতায় নিজেকে কখনো অপমান করেননি ইন্দিরা। তার জন্যে অনেকটা মূল্য দিতে হল তাঁকে। আক্ষরিক অর্থেই একবুক রক্ত সমেত নিজের প্রাণ সম্পদটি দিলেন তিনি এর মূল্যস্বরূপ। আমরা ঠিক জানি না, তবু ভাবতে ভালো লাগছে শিক্ষাগুরুর সেই উপদেশকেই তিনি শিরোধার্য করেছিলেন – 'ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান/নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ'। সত্যি সত্যি হিংসার মুখোমুখি হয়ে নীরব নম্র ভাবে প্রাণ বলি দেবারও এমন দৃষ্টান্ত রচনা করলেন ইন্দিরা, ভূ-ভারতে যার তুলনা মেলা ভার।

ইতিহাসে হত্যাকারী মাত্রই কাপুরুষ নয়, কিন্তু ইন্দিরার আততায়ীরা এমনই ভীরু, এতটাই নীচ যে, নিজেদের উদ্দেশ্যসাধন করলেন তারা উদার বিশ্বাসভাজনের সুযোগ নিয়ে, এমনকি, যে বুলেটে তারা এই অশংসয়িতচিত্ত দীপ্তিময়ী নিরস্ত্র নারীকে বিদ্ধ করলেন, তাও তাদের নিজেদের অধিকার বা ক্ষমতা দ্বারা অর্জিত নয়। সেদিক থেকে বলতে দ্বিধা নেই, এই নির্বোধ হত্যাকান্ড পৃথিবীর সমস্ত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতিও চরম কটাক্ষ হানল! এতে এই ষড়যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট নায়কেরা কতটা লজ্জা পাবে জানি না, কিন্তু এটা ঠিক, দেশ ছাপিয়ে বিদেশের কোটি কোটি মানুষের প্রিয় ইন্দিরা গান্ধী নিজের জীবন দিয়ে সেদিকেও একবার আমাদের নজর কাড়লেন। তাঁকে নিয়ে যত বিতর্কই থাক, সারাজীবনের কর্মে যেমন, তেমনি তিনি তাঁর মৃত্যুতেও হয়ে রইলেন অনন্যসাধারণ এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। সব মিলিয়ে মনে হয় যেন তিনি ছিলেন ইতিহাসেরই মানসকন্যা।

জানা যায়, শৈশবে ইন্দিরা ইতিহাস পড়তে ভালবাসতেন। আর এই ভালবাসায় উৎসাহ যোগাতেন স্বয়ং তাঁর পিতা পন্ডিত জওহরলাল নেহরু। একাধারে তখন থেকেই যিনি ছিলেন প্রখর রাজনীতিক এবং সুলেখক। কারাবাসকালে তিনি তাঁর 'প্রিয়দর্শিনী' কন্যা ইন্দিরাকে বিশেষ এক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যে সকল চিঠি লিখতেন তার মধ্যে একই সঙ্গে উচ্চারিত হত তাঁর পিতৃত্বের স্নেহ ও শিক্ষা। নৈনি কারাগার থেকে এগারো বারো



পাহাড়তলীতে মেয়েদের সংগে নৃত্যরতা ইন্দিরা

বছরের নাবালিকা ইন্দিরাকে এমনই এক চিঠিতে জওহরলাল লিখেছিলেন, – 'ইতিহাস পড়া ভাল, আরও ভাল ইতিহাস সৃষ্টিতে সাহায্য করা।' পিতাপুত্রীর কি অমোঘ বোঝাপড়া দেখুন। জওহরলালের সেদিনের সে পরামর্শ সারাজীবন ধরে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেলেন ইন্দিরা। আজ থেকে ৬৭ বছর আগে এলাহাবাদের বিখ্যাত আনন্দ-ভবনে জওহরলাল ও কমলা নেহরুর পরিবারে একমাত্র সন্তান হিসেবে যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন কে আর ভেবেছিল সর্বার্থেই পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার অর্জন করে এই শিশুটিই কোমলে-কঠোরে,-বিচারে, বুদ্ধিতে, দর্শনে,দূরদর্শিতায় আগামী দিনে আত্মপ্রকাশ করবেন তাঁর জন্মভূমির প্রধান ভাগ্যনিয়ন্তা হিসেবে, দেশে বিদেশে স্বীকৃত হবেন অপ্রতিরোধ্য অবিসংবাদী প্রিয়তম মহিলা, শ্রদ্ধাভাজন নেত্রী হিসেবে। ভাবতে না পারলেও নিশ্চয়ই তাঁর মধ্যে এর সব ইংগিতই ছিল। ছেলেবেলায় ইন্দিরার প্রিয়তমা নারী ছিলেন জোয়ান অব আর্ক। এই জোয়ান অব আর্কের কথা ভাবতে ভাবতে একবার নাকি নিজেরই এক ছবি এঁকে ফেলেছিলেন তিনি। যে ছবিতে ইন্দিরা ছিলেন অশ্বারোহিণীর ভূমিকায়, তাঁর এক হাতে লাগাম ধরা, অন্য হাতে তরোয়াল – তাড়া করছেন ব্রিটিশদের।

শৈশবের এই খেয়ালী চিত্রকলার মধ্যেই পরবর্তীকালের ইন্দিরার ইমেজটি সেদিন ধরা পড়েছিল – যিনি একই সংগে সাহসী এবং সংযত। ইন্দিরা জানতেন, তাঁর প্রিয়তম নারী জোয়ানকে জোর করে হত্যা করা হয়েছিল; আমরা জানলাম, ইন্দিরাকেও হত্যা করা হল প্রায় একইভাবে। এই মিলের সূত্র একটাই, জোয়ান অব আর্কের মত ইন্দিরাও ছিলেন দৃঢ়চেতা। এই দৃঢ়তা তিনি অর্জন করেছিলেন অতি অল্প বয়স থেকেই। এই প্রসংগে নিজের শৈশব সম্পর্কে একজায়গায় ইন্দিরারই লেখা একটি কাহিনী এখানে স্মরণ করছি – পরাধীন দেশে তখন গান্ধীজির ডাকে বিলিতি কাপড় জামা পোড়ান হচ্ছে। সে সময় এক আত্মীয়া ইন্দিরাদের বাড়ি বেড়াতে এসে ইন্দিরাকে দিতে চাইলেন সেলাই-এর চমৎকার কাজ করা সুন্দর একটি বিলিতি জামা। জামাটা দেখে ইন্দিররা খুবই লোভ হচ্ছিল। আত্মীয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন – এটা তোমার পছন্দ হচ্ছে ?

উত্তরে ইন্দিরা বললেন, পছন্দ হচ্ছে কিন্তু....। আত্মীয়াটি বুঝতে পারলেন, ইন্দিরা তাঁকে কি বলতে চাইছে। তাই তিনি বললেন, বিলিতি জামা পরবে না যদি তোমার পুতুলটা বিলিতি কেন ?

কথাটা শুনে ইন্দিরা সত্যি সত্যি চমকে উঠলেন। আসলে শিশু ইন্দিরা ভালবাসার পুতুলটিকে নিয়ে সেভাবে কখনো ভাবেননি। তিনি পুতুলকে কখনোই নিষ্প্রাণ মনে করতেন না। তাই তাঁর সব পুতুলেরই ছিল এক একটি নাম। বিশেষ করে এই বিলিতি পুতুলটা ছিল তাঁর খুবই আদরের আর প্রিয়। একে রাখা না রাখা নিয়ে সরলমতী ইন্দিরা পড়লেন মহা দ্বন্দ্বে। একদিকে শখের পুতুলটির প্রতি মায়া মমতা, অন্যদিকে দেশের প্রতি কর্তব্য। কোনটাকে আগলাবেন তিনি। চাপা উত্তেজনার মধ্যে তিনি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। কাঁপা কাঁপা পায়ে পুতুলটিকে নিয়ে গেলেন ছাদে, নিজের হাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন তার গায়ে। তারপরই সে কি কান্না, সে কান্না যেন কোনদিনই থামবে না আর। এরই জের টেনে পড়লেন অসুখে। সত্যি কি আশ্চর্য, ঐ কোমল বয়েসেই তিনি তাঁর দেশের প্রতি ভালবাসাকে ব্যক্তিগত ভাললাগার উপরে বসাতে পেরেছিলেন। এবং তার জন্যে ঐ কঠিন কর্তব্য সম্পাদনেও ছিলেন অনমনীয় এবং অটল। এমন একটি চরিত্র সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করতে গিয়ে আমাদের অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে যায় চিত্রাংগদার কথা – স্নেহে সে নারী, বীর্যে সে পুরুষ।



এলাহাবাদের আনন্দভবনে ১৯১৭-র ১৯ নভেম্বর জন্ম। ইন্দিরার চার বছর বয়সে ১৯২১-র ৬ ডিসেম্বর জওহরলালের প্রথম কারাবাস।

১৯২২-এ তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। সাবরমতীর গান্ধী আশ্রমে কয়েক মাস কাটাবার পর ১৯২৩ সালে তিনি ভর্তি হন এলাহাবাদের সেন্ট সিসিলিয়া স্কুলে। মার চিকিৎসার জন্য বাবার সংগে প্রথম ইউরোপ যাত্রা মার্চ ১৯২৬। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ভর্তি হন এলাহাবাদের সেন্ট মেরি কনভেন্টে। ১৯২৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর চরকা সংঘের শিশু বিভাগে যোগদান করেন। 'বানর সেনা' গঠন করেন ১৯৩০ সালে। ১৯৩১ সালে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে দুটি আঘাত – ১ জানুয়ারি কমলা নেহরুর কারাবরণ, ২ ফেব্রুয়ারি মতিলাল নেহরুর মৃত্যু। ওই বছরেরই মে মাসে বাবা-মার সংগে সিংহল ভ্রমণ শেষে পুনের পিপলস ওন স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৩৪ সালের এপ্রিলে ওই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জুলাই মাসে ভর্তি হন শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীতে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা শেষে সুইজারল্যান্ডের একটি স্কুলে ভর্তি হন। এখানকার সামারভিল কলেজে পড়ার সময় ১৯৩৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াণ ঘটে কমলা নেহরুর। এই বছরেই জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যা হন তিনি। ১৯৩৭ সালের মে মাসে বাবার সংগে মালয়েশিয়া, সিংগাপুর, বার্মা ভ্রমণ করেন। পরে যান ফ্রান্স, চেকোশ্লাভাকিয়া এবং হাংগেরি। ১৯৩৮ সালে ব্রিস্টলের ব্যাডমিন্টন স্কুল এবং অকসফোর্ডে পড়াশোনা। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে সুইজারল্যান্ড যাত্রা চিকিৎসার জন্য। ১৯৪১ সালে ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, লন্ডন, আফ্রিকা হয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন, সংগে সহপাঠী ফিরোজ গান্ধী। ১৯৪২-এর ২৬ মার্চ ফিরোজ গান্ধীর সংগে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ

ইন্দিরা গান্ধী ১৯১৭ – ১৯৮৪



১৯৮৩ সালে শান্তিনিকেতনে



হন। এই বছরের ৮ আগস্ট এ আই সি সি অধিবেশনে যোগদান এবং ১০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে কারাবরণ করেন।

আট মাস পরে ১৯৪৩-এর ১৩ মে তাঁর কারাবাসের কাল শেষ হয়। প্রথম সন্তান রাজীবের জন্ম ১৯৪৪-এর ২০ আগস্ট। ১৯৪৬-এর ১৪ ডিসেম্বর জন্ম সঞ্জয়ের। ১৯৪৭-'৬৪ বাবা জওহরলাল স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। গান্ধীজীর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৮। গান্ধীজীর মৃত্যু ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে কংগ্রেসের অন্যতম সদস্যা হিসেবে মিলিত হন বিশ্বনেতাদের সঙ্গে। ওই বছরেই প্যারিসে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে যোগদান। ১৯৫৩ সালে প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ। ইন্দোনেশিয়ায় বান্দুং সম্মেলনে যোগদান করেন ওই বছরেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মাদার্স অ্যাওয়ার্ডস' লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে বাবার সঙ্গে চীন সফর। ওই বছরের ২০ সেপ্টেম্বর দিল্লির তিনমূর্তি ভবনে শিশুমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। ১৯৫৫ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা এবং এর কিছুদিন পরে কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির সদস্যা। ১৯৫৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদ নগর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত ১৯৫৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ফিরোজ গান্ধীর মৃত্যু। জওহরলালের মৃত্যু ২৭ মে ১৯৬৪। ১৯৬৪ সালের ২ জুলাই শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় তথ্য বেতার মন্ত্রী হিসেবে যোগদান। ২০ আগস্ট রাজ্যসভায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। মোরারজি দেশাইকে হারিয়ে সংসদীয় কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন ১৯৬৬ সালের ১৯ জানুয়ারি। ২৪ জানুয়ারি বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ। ওই বছরেই দিল্লিতে টিটো, নাসের এবং ইন্দিরার মধ্যে ত্রি-শীর্ষ বৈঠক। ১৯৬৭ সালের ৮ জানুয়ারি ভুবনেশ্বরের এক নির্বাচনী সভায় আক্রান্ত হন। রায়বেরিলি থেকে নির্বাচিত হন ফেব্রুয়ারি মাসে এবং কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন এর কয়েকদিন পরে। দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ১৩ মার্চ ১৯৬৭। রাজীব বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন ১৯৬৮-র ২৪ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাওল্যান্ড স্মৃতি পুরস্কার লাভ। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণদান ১৪ অক্টোবর ১৯৬৮। ১৯৬৯-এর ১৯ জুলাই ব্যাংক জাতীয়করণ অর্ডিনান্স জারি এবং মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগ। ২০ আগস্ট ভি ভি গিরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। অর্থমন্ত্রী হিসেবে লোকসভায় প্রথম বাজেট পেশ ১৯৭০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। ওই বছরের ১৭ মার্চ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদীয় দলনেত্রী নির্বাচিত এবং ৮ সেপ্টেম্বর লুসাকায় তৃতীয় নির্জোট শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান।



পিতা জওহরলালের সঙ্গে

প্রথম সোভিয়েত সফরকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

লোকসভা বাতিল হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টে আপিল ১৯৭১ সালে। ওই বছরের মার্চ মাসে ইন্দিরার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন দান ২৭ মার্চ ১৯৭১। ৩১ মার্চ লোকসভার উপ-নির্বাচনে জয়লাভ। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে 'শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতা' চুক্তি ৯ আগস্ট। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণা ৪ ডিসেম্বর এবং ওই দিনই সংসদে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ইন্দিরা। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের লেঃ জেনারেল নিয়াজির বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশের জন্ম। ১৭ ডিসেম্বর ইন্দিরার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা। ১৯৭২ সালে 'ভারতরত্ন' লাভ করেন বাংলাদেশের সংকটকালে তাঁর সার্থক নেতৃত্বদানের জন্য। ১৫ মার্চ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ। ১৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ সফর এবং পরের দিন ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর। জরুরী অবস্থা ঘোষণা ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন। ১৯৭৭ সালে নির্বাচনে ইন্দিরার পরাজয়। আবার জয়লাভ ১৯৮০-র নির্বাচন এবং শেষবারের মতো প্রধানমন্ত্রী পদ লাভ। ওই বছরেই বিমান দুর্ঘটনায় পুত্র সঞ্জয়ের মৃত্যু। ১৯৮২-র নবম এশিয়াডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ। ১৯৮৩-র মার্চে আই ও সি-র 'গোল্ডেন অর্ডার' লাভ। ১৯৮৩-তে নির্জোট সম্মেলনের চেয়ার পার্সন নির্বাচিত এবং এই বছরই এ আই সি সি-র ৭৭তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়। ১৯৮৪-র ৩০ অক্টোবর ভুবনেশ্বরের প্যারেড গ্রাউন্ডে শেষ ভাষণদান। ৩১ অক্টোবর নিজেরই নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে শোচনীয় মৃত্যু।

ইন্দিরার সম্মান

ইন্দিরা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দেশবিদেশের বহু পুরস্কার এবং সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ 'ভারত রত্ন' উপাধি লাভ করেন ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবিস্মরণীয় দানের জন্য ওই বছরই 'মেক্সিকান অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড' পান। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার পান ১৯৭৩-এ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মাদার্স অ্যাওয়ার্ড' পান ১৯৫৩ সালে। ওই দেশেরই আর একটি সম্মানে ভূষিত হন ১৯৭১-এ। এই পুরস্কার দেওয়া হয় 'পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশংসিত মহিলা'-কে, যার বিচার হয় গণভোটের মাধ্যমে। ১৯৭১-এই ফরাসী দেশ থেকেও পান 'পৃথিবীর সবচেয়ে প্রশংসিত মহিলা'-র সম্মান। এখানেও একই পদ্ধতিতে বেছে নেওয়া হয় শ্রেষ্ঠ মহিলাকে। ১৯৬৭, ১৯৬৮ পরপর দুই বছর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'হাওল্যান্ড স্মরণ পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৭১ সালে আর্জেন্টিনা তাঁকে ভূষিত করে 'ডিপ্লোমা অফ অনার' দিয়ে। নেদারল্যান্ডের 'অরডার অফ দ্য গোল্ডেন আর্ক'-এর সম্মানলাভ করেন ১৯৮২-তে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ইতালী সরকার তাঁকে 'ইসাবেলা দ্য ইস্তে অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মান জানান ১৯৮২-তে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পপুলেশন অ্যাকশন কাউন্সিল তাঁকে 'ডিসটিংগুইশড পারলামেনটারিয়ান পুরস্কার' দেন একই সালে। ১৯৮২-তেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো একটি পুরস্কার লাভ করেন। পূর্ব এবং পশ্চিমের সমঝোতাকে সুদৃঢ় করার জন্য 'উ থান্ট অ্যাওয়ার্ড' পান। ১৯৮৩ সালে 'ইউ এন পপুলেশন অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

ইন্দিরা গান্ধীর প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে আছে –

দ্য ইয়ারস অফ চ্যালেঞ্জ – ১৯৬৬-৬৯
দ্য ইয়ারস অফ এনডোভার – ১৯৬৯-৭২
ইন্ডিয়া – ১৯৭৫
ইটারনাল ইন্ডিয়া – ১৯৮০
মা ভারাইট – ১৯৮০
মাই ট্রুথ – ১৯৮১
অফ পিপলস প্রবলেমস – ১৯৮২

[তথ্য সংকলন : মৃণালকান্তি দাশ]

প্রচ্ছদ চিত্র : বাঁদিকের উপর ও নিচের ছবি দুটির আলোকচিত্রী প্রবীর দাস মাঝের ছবির আলোকচিত্রী জয়ন্ত চৌধুরী



সোল অব ইন্ডিয়া

জওহরলাল নেহরুর পত্রগুচ্ছ-র প্রথম চিঠি

[আমার কন্যা ইন্দিরার জন্মগ্রহণের খবর পেয়ে সরোজিনী নাইডু এই চিঠি লেখেন।]

মাদ্রাজ, ১৭ ডিসেম্বর, ১৯১৭

প্রিয় জওহর,

তোমাদের শুভসংবাদ পাবার পর এমন এক মুহূর্ত সময় পাইনি যে তোমাকে আর কমলাকে অভিনন্দন অথবা আমার নতুন ভাগনীটিকে আশীর্বাদ জানিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসব। প্রতিটি দিনই এখন কাজকর্মে ঠাসা, তারই মধ্য থেকে কোনক্রমে আধমুহূর্ত সময় ছিনিয়ে নিয়ে দুটোই এবারে জানালাম। মাদ্রাজ পাগল হয়ে গিয়েছে, একেবারে পাগল! ভাব দেখে মনে হয়, আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে।

তুমি যদি কলকাতা যাও, তাহলে ৭ হাংগারফোর্ড স্ট্রীটে গেলেই আমার সংগে দেখা হবে। দেখা করতে ভুল না। তোমাকে এক কপি সোল অব ইন্ডিয়া পাঠাচ্ছি। এ-বইয়ে আমি মন্টেগু-বোমার জবাব দিলাম।

সবাইকে ভালবাসা এবং নবজাত সোল অব ইন্ডিয়াকে চুম্বন জানাই।

প্রীত্যর্থী
সরোজিনী নাইডু

মহামূল্য সম্পদ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি জওহরলালকে

[কমলা নেহরুর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায় স্থির হয় চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপে পাঠান হবে। জওহরলাল তখন আলমোরা জেলে। পরেও তাঁকে সেখানেই থাকতে হয়। তবে ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে জওহরলাল যাতে তাঁকে বিদায় জানিয়ে আসতে পারেন, তাই একদিনের জন্য তাঁকে জেল থেকে বাইরে যেতে দেওয়া হয়েছিল। জওহর-কন্যা ইন্দিরা তখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন। তিনি মায়ের সংগে ইউরোপ যাত্রা করেন।]

"উত্তরায়ণ"
শান্তিনিকেতন, বাংলা,
২০ এপ্রিল, ১৯৩৫

প্রিয় জওহরলাল,

ইন্দিরাকে আমরা সবাই এক মহামূল্য সম্পদ বলে মনে করতাম; ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাই তাকে আমাদের বিদায় জানাতে হয়েছে। খুবই ঘনিষ্ঠভাবে তাকে আমি দেখেছি; দেখে যে-ভাবে তাকে তুমি মানুষ করে তুলেছ তার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করেছি। শিক্ষকরা সবাই একবাক্যে তার প্রশংসা করেন, ছাত্রমহলেও সবাই তাকে খুবই ভালবাসে। আশাকরি আবার সুসময় আসবে, এবং ইন্দিরাও আবার শিগগিরই এখানে ফিরে এসে তার পড়াশুনোয় মন দিতে পারবে।

সস্নেহ আশীর্বাদান্তে ইতি।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দহন

মিহির মজুমদার

অনেকটা পথ। জোরে জোরে হেঁটে একঘণ্টার কম সময়েই চলে এসেছি আমরা প্রায় কুড়ি-বাইশজন।

অমিতাভ ওর হাতঘড়িটায় তাকিয়ে বলল একটা বাজতে দশ। রাত প্রায় বারটায় রওনা দিয়েছিলাম। ফাঁকা রাস্তা। যানবাহনের উৎপাত ছিল না। মাঝে মাঝে দু একটা ট্যাক্সি আর লরি তীব্র গতিতে গন্তব্যের দিকে ছুটছিল।

আমি আর অমিতাভ খানিকটা দূরত্ব রেখে বিমলকে নিয়ে হাঁটছিলাম। হরিধ্বনি দিতে দিতে বাদবাকি সকলে শব কাঁধে নিয়ে কিছুটা এগিয়ে।

আচমকা মারা গেলেন বিমলের মা। সেরিব্রাল হেমারেজ। পান সাজতে সাজতে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। তারপর পড়ে গিয়েই অজ্ঞান। ডাক্তারবাবু বললেন হাসপাতালে পাঠাতে। কিন্তু যাবার পথেই সব শেষ।

বিমলের ছোট দু ভাই কাঁদছিল খুব। ওদের বন্ধুরা সাধ্যমত সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কিন্তু সান্ত্বনায় শোক কমে না।

বিমলের দুই দিদি এসেছিল ট্যাক্সিতে একজন বাতে পংগু। তার চোখে জল ছিল না। বোবা দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল ফুলে ফুলে ঢাকা মার নিস্পন্দ দেহটার দিকে। ভাবছিল এখন থেকে বাতের যন্ত্রণায় ওর সারা শরীরটা যখন কুঁকড়ে যাবে তখন আর মাকে ডাকলে পাবে না। মশারির ভেতর রাত জেগে বসে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না, 'ও কমলা ব্যথাটা একটু কমল?'

শবযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজন শব সৎকারের আবশ্যিক বিধি ব্যবস্থা তদারকিতে ব্যস্ত। আমি বিবর্ণ একটা কাঠের বেঞ্চে এসে বসেছি। পাশে কমলাদি। অন্য কয়েকজনও এসে বসেছে। চিতার ধোঁয়ায় কার্তিকের হিম-মাখানো বাতাসে ময়লা রঙ।

খানিকটা দূরে চিতার পাশে বসে একটা ফর্সা রোগা চেহারার ছেলে। সে নির্বাক। তার চোখে জল। পাশের একজন বলল, ছেলেটার বাবা মারা গেছে।

খুঁজতে খুঁজতে অরিন্দম আমার কাছে এসে বসল। ওর সিগারেট আর দেশলাই চাই। শ্রান্ত ক্লান্ত অরিন্দম আমার কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। অরিন্দম একটু বেপরোয়া স্বভাবের ছেলে। কিন্তু এখন সে চুপচাপ। মৃত্যুর ভিড়ের মধ্যে মানুষ কথা বলতে ভুলে যায় বোধহয়।

আমার হাতঘড়িতে রাত এখন দুটো। দূরের চায়ের দোকানটায় চার-পাঁচজন বসে।



আকাশে ভাঙা চাঁদ। তারাদের ঝিকিমিকি। দূরে কোন শিউলিগাছে এখনও বোধহয় কয়েকটা ফুল ফুটেছে। তার মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে।

গভীর রাতের শ্মশানভূমিতে ছায়া ছায়া আলো-আঁধারে বাকহারা মানুষজনকে ঘিরে নৈঃশব্দ্য যখন জমাট বাঁধছে, ধীরে ধীরে – তখন কোথা থেকে আচমকা এক কিশোরী দৌড়ে এসে দাঁড়াল প্রায় আমাদের কাছটাতেই। ভয়মেশানো চোখে চারিদিক তাকিয়ে ও বেঞ্চটার এক কোনায় বসল।

ছুটে আসার ক্লান্তিতে ওর বুক দ্রুত ওঠানামা করছিল। ষোড়শী বলে মনে হল। কিছু কমবেশি হতে পারে। মুখে পাউডারের অযত্ন প্রলেপ। চোখে কাঁচা হাতে টানা কাজলরেখা। রঙ ময়লা। পরনের কাপড় আরও ময়লা। হাতে রজনীগন্ধার একটা ছেঁড়া মালা। ওর মুখে শোকের তো চিহ্ন নেই। তবে এত রাতে শ্মশানে......!

মন চোখ ওর দিকে থাকায় খেয়াল করিনি পাশে কখন একটা ছেলেও এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি তাকে দেখে ভয়ে পাথর।

– এই শালী চল......। মাত্রাতিরিক্ত মদের প্রতিক্রিয়ায় ছেলেটার পা দুটো টলছিল। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পানের কষ গড়াচ্ছিল। ছেলেটা কেবলই বলছিল, 'এই শালী চল।'

এতক্ষণ পরে মেয়েটি কথা বলল – 'আমার শরীর খারাপ। সত্যি বলছি। আজকের দিনটা মাপ কর।'

ছেলেটার চোখে কামনার আগুন। এলোমেলো পা ফেলতে ফেলতে ছেলেটা দ্রুত এগিয়ে এল মেয়েটিকে ধরতে। আঁচলটাকে শক্ত মুঠিতে ধরে মেয়েটি দৌড়ে সরে গেল দূরে।

– দে শালী টাকা ফেরত দে।

টাকা আছে নাকি! খরচ হয়ে গেছে। মেয়েটির অকপট স্বীকারোক্তি। ভয়-পাওয়া এক রাতজাগা পাখির মতো মেয়েটির সারা শরীর কাঁপছিল থরথর করে। আর উত্তেজনায় ছেলেটা অজগরের মতো ফুঁসছিল। চোখে কামনার আগুনে ক্রোধ মিশল। –যত শালা আপদ। ভাগ এখান থেকে। দূর আকাশের তারা দেখছিল যে লোকটা – সে বিরক্ত হল। মেয়েটি ছুটে পালাল। মাতাল ছেলেটা টলতে টলতে ওর পিছু ধাওয়া করল।

অরিন্দম আমায় ডেকে নিয়ে গেল বিমলের কাছে। ওখানে থাকা দরকার। বিমলের মার শবদেহকে ঘিরে আগুনের হিংস্র উল্লাস। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ। বিমল কাঁদছিল শিশুর মতো।

– কি হে সুমন বড় কষ্ট হচ্ছে?

– হ্যাঁ।

– বাবার কথা মনে পড়ছে তো?

পড়বে না! এই চিতাতেই তো......

– সবারই তো এক পরিণতি। জানো না – জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যুঃ।

–জানি।

–তবে কাঁদছ কেন?

চোখ দুটো ভিজে গিয়েছিল। মুছে ফেললাম। কাঁদছে আরও অনেকে। বিমলের দুই ভাই। দুই দিদি।

একটা চিতার আগুন নিবে এসেছে। তিনটে জ্বলছে। অনেকগুলো মানুষ চিতার আশে-পাশে। প্রিয়জনের শরীরটা যতক্ষণ না আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে – ততক্ষণ বসে বসে দেখতে হবে। বুকের ভেতরটা যতই মোচড় দিক, চোখে যতই ঝরনা নামুক, তবুও।

বিমল মাথায় হাত দিয়ে বসে। একরাশ উসকো-খুসকো চুল মাথায়। বিমলের পাশে অরিন্দম।

হেমন্তের কুয়াশামাখা চিতার ধোঁয়ায় চারিদিককার দৃশ্যপট অস্পষ্ট। কেবল চিতার পাশে বসা শোকার্ত মানুষগুলোর মুখে চিতার আগুনের রক্তিমাভা।

দূরে হরিধ্বনির শব্দ থিতিয়ে পড়া

...শব্দে আঘাত করছে বার বার। আবার কেঁদে আসছে। কমলাদি বোবা দৃষ্টিতে সেই আওয়াজকে খুঁজতে লাগল। কমলাদির হুঁশ আছে তো! দূরে ওর মার চিতায় এতক্ষণে কাঠ সাজানো শেষ।

বিমল উঠে গেল মুখাগ্নি করতে। চিতার পাশে আরও শবযাত্রীরা দাঁড়িয়ে। তারা নির্বাক। বিমলের ছোট ভাইটা ডুকরে কেঁদে উঠল।

আমি কয়েক পা এগিয়ে শ্মশানের পাশে একটুকরো সবুজ জমিতে এঁকটা বেঞ্চে এসে বসলাম। এদিকটায় নিরিবিলি। কয়েকটা পাম গাছ এদিকে-ওদিকে। দু-তিনটে কাদামাখা শুয়োর ঘুরছে।

দূরে কোথায় পেটাঘড়িতে শব্দ করে তিনটে বাজল। আকাশে তারাদের ঝিকিমিকি। রাতের নিস্তব্ধতায় হেমন্ত কুয়াশার চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে চার দিগন্তে। বাতাসে হিমেল ছোঁয়া।

অদৃশ্য হাওয়া লেগে চিতার আগুনের উদ্দামতা মাঝে মাঝে। মড়া পোড়ার গন্ধ। হাওয়ায় ভাসা ছাই। নেশাগ্রস্ত ডোমদের চোখে নিদ্রার ছোঁয়া। কাছেই একটা বিরাট শিরীষের সবুজ বিস্তার। নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনা।

বিমলের ছোট বোন ঝুমা আসেনি। এতবড় অঘটনের খবর ও জানে না। আসানসোল গেছে। স্বামীর এক পিসতুতো ভাইয়ের অসুখ। তার খোঁজখবর নিতে।

বিয়ের পর ঝুমার চেহারায় লাবণ্য এসেছে। বিয়ের আগে ছিল ছিপছিপে। সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। একমাথা চুল। টানা টানা চোখ। নাকটা একটু চাপা। কিন্তু মানানসই।

বিমলদের বাড়িতে আমার যাতায়াত ছিল। বিমলের বাবা সামান্য মাইনের চাকরি করতেন। বড় সংসার। যা হয়। ধার দেনা হত। বিমলের এক দিদি মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাত। কিছুটা সাশ্রয় হত তাতে।

বিমলের মার ছোটবেলা সচ্ছলতার মধ্যে কেটেছে। বিয়ের পর থেকেই অভাব তাঁর নিত্য সংগী। তাই নিয়ে অনুযোগ করতেন স্বামীর সংগে বিবাদ বাধত। আমি স... শুনতাম। দেখতাম।

কমলাদির বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। বাঁ... পংগু। বয়সও হয়েছিল। সমস্যা ছিল ঝুমাকে নিয়ে।

ঝুমার পড়াশোনায় মাথা ছিল। বই ছিল না। দেখাশোনার লোক ছিল না তবু বি এ পাশ করেছিল। আরও পড়ার ইচ্ছা ছিল ঝুমার হয়নি। চাকরির চেষ্টা করেছিল খুব। পায়নি।

সংসারে অভাব অনটন, বাবা-মার বিরোধ ঝুমা... সওয়া হয়ে গিয়েছিল। মা... মনে... ...র প্রাচীর ছায়া... ...রোজ কাঁচি... ...লাগে। ...ওপর মমতা ছিল ...ছিল ...আমাকে ওর ভবিষ্যতের ভাবনার কথা বলত। কে বিয়ে দেবে – কোথায় বিয়ে হবে – এইসব।

ঝুমার বাবার হাই প্রেসার ছিল। কমলাদির বাত। দুজনের ওষুধ লাগত রোজ তিন-চার টাকার। সংসারে অভাব-অনটন বাড়ছিল দিন দিন। ঝুমার অস্থিরতাও বাড়ছিল। মনে হতাশা জমাট বাঁধছিল।

ঝুমার কয়েকটা ভাল সম্বন্ধ এসেছিল। আমার কথা ভেবে তাতে মত দেয়নি।

ঝুমা জানত ওকে আমার ভাল লাগে। জানত ওদের বাড়ির অনেকেই। ঝুমা চাইত আমি ওর ভার নিই। আমার কিছু বাধা ছিল। ঝুমার কাছে সময় চেয়েছিলাম। ঝুমা ভয় পেয়েছিল – সময় যদি ওর স্বপ্নটাকে ভেঙে দেয়! ঝুমা ওর বাড়ির চাপের কথাও বলেছিল। বলেছিল ও কত একা। নিঃসংগ। আমার ওপর ঝুমার ক্ষোভ জমেছিল। অভিমানও। রাগে, দুঃখে, অভিমানে বিয়ে করেছিল বাড়ির পছন্দসই পাত্রকে।

কেমন আছে ঝুমা? ও শান্তি পেয়েছে তো? মাঝরাতের শ্মশানভূমির এক ঝলক হুহু বাতাস একরাশ ব্যথা ছড়িয়ে গেল।

ভাবনায় ডুবে ছিলাম। আচমকা চিৎকার চেঁচামেচিতে পেছনে তাকালাম। সেই মেয়েটি। ছেলেটাও। ওরা কখন আবার ফিরে এসেছে। আনমনে চিতার আগুনের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি জীবনের শেষ পরিণতি দেখছিল বোধহয়। সুযোগ বুঝে ছেলেটা ফের থাবা বাড়িয়েছে।

ঘুম ভাঙছে ভোরের। পূবের আকাশে রক্তিমাভা ক্রমেই তার ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফিকে হয়ে আসছে। চিতার কাঠগুলো এখন জ্বলে পুড়ে ছাই। কেবল আগুনের গোপন উৎস থেকে নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে।

কাছের দূরের দৃশ্য বস্তুগুলোর অবয়ব স্পষ্ট হচ্ছে ধীরে ধীরে। রাস্তার নিয়ন আলোগুলো জ্বলছে। ভোরের ধোঁয়াশায় আলোগুলো কেমন নিষ্প্রভ! চা প্রত্যাশী কিছু মানুষ চায়ের দোকানে জ্বলন্ত উনুনের পাশে ভিড় করেছে। মালবোঝাই কয়েকটা লরি নিঃশব্দ শহরে ইঞ্জিনের ধাতব আওয়াজ তুলে ছুটে গেল গন্তব্যে। 'সাইলেন্সার' এর কালো ধোঁয়ার সংগে ভেসে এল ডিজেল আর গ্যাসোলিনের গন্ধ।

সাইকেলে বিশাল এক 'ক্যান' ঝুলিয়ে তুলসীদাসী রামায়ণের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এক দুধওয়ালা চলেছে কোথায়!

শ্মশানের চাতালে এখনও কয়েকজন ছেঁড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ছড়ানো-ছিটোনো একরাশ ছেঁড়া কাগজ আর কাপড়ের স্তূপের ...খোলা আকাশের নিচে এক বিধবার ...শিরীষের ডালপালায় পাখিদের ডাকাডাকি। রাত-ঘুমের পর ওদের ...এখন চঞ্চলতা। নীল আকাশের ...উড়ে যাবে দূরে।

...স্বচ্ছ আলোছায়ায় চিতার ধোঁয়া উঠছে এখনও। ছাইয়ের টুকরো ভাসছে এখানে-ওখানে।

ভোরের প্রথম আলোয় বিমলের মুখে শোকের মেঘ জমেছে। বিমলের মার চিতায় মাটির কলসি দিয়ে জল ঢালছে শবযাত্রীরা। সংগে হরিধ্বনি।

কমলাদি ডুকরে কেঁদে উঠল। ভোরের বাতাসে কান্নার ঢেউটা হারিয়ে গেল দূরে।

পূবের আকাশে সূর্য সন্তর্পণে পলক মেলেছে।

শ্মশানের পাশে একটুকরো সবুজ জমিতে ঘাসে ঘাসে শিশির জমে আছে এখনও। এক ধারে অযত্নে বেড়ে ওঠা ভুঁইচাঁপার ঝোপ। আশ্চর্য সবুজ ওদের পাতাগুলো। সেই পাতার আড়ালে ঘুমিয়ে আছে একটি মেয়ে। অবিন্যস্ত বেশবাস। চোখের কাজল, ঠোঁটের রঙ আর কপালের টিপ মিলেমিশে সারা মুখে একাকার। হাতের কাঁচের চুড়ির কয়েকটা ভেঙে পড়ে আছে পাশে।

কাল রাতের সেই মেয়েটি। অবাক চোখে চিতার আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে যে জীবনমৃত্যুর রহস্য খুঁজছিল। এক সময় ধরা পড়েছিল সেই মাতাল ছেলেটার বাহুবন্ধনে – কামনার আগুনে যার চোখ দুটো চিকচিক করছিল কাল রাতের আঁধারে। তারপর আদিম জৈব প্রবৃত্তির উথাল-পাতাল ঝড়ের দাপটে মেয়েটির অপলকা শরীরটা লুটিয়ে পড়েছিল একসময় ভুঁইচাঁপার ঝোপে।

--বল হরি, হরিবোল।

কমলাদিকে নিয়ে বিমল আর অরিন্দম শ্মশান থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়াল অনাদের অপেক্ষায়। বিমলের এক দিদি কমলাদির পিঠে মাথায় হাত দিয়ে স্নেহপ্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছিল।

রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে। দুএকটা রিকশা সওয়ারি নিয়ে ছুটছে। কাছের কোন এক কারখানায় সাইরেন বেজে উঠল। একদল ষোড়শী শাড়ি আর ব্লাউজে শরীর জড়িয়ে যৌবনের উচ্ছলতায় হাসি আর শব্দের ফোয়ারা ছড়াতে ছড়াতে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে চলেছে কলেজে।

ভুঁইচাঁপার ঝোপে মেয়েটি এখনও ঘুমিয়ে প্রভাতের জীবনবন্যার ঢেউ ওকে ছুঁতে পারেনি।

রাতের শ্মশানে মৃতদেহ ঘিরে চিতায় চিতায় যখন আগুনের শিখা ওঠে তখন ও জীবনের খোঁজে চিতার পাশে পাশে ছুটে বেড়ায়। চিতার আগুনের শিখা ওর নিষ্প্রভ প্রাণবহ্নিকে উসকে দেয়।

ভুঁইচাঁপার ঝোপে রোজ রাতের আঁধারে মৃত্যু এসে আলিঙ্গন করে ওকে। সকলের অগোচরে। ও মৃত্যুর আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দেয়। মৃত্যুর বিনিময়ে ও জীবন পায়। বাঁচার জন্যে ওকে রোজ রাতে মৃত্যুর সংগে লুকোচুরি খেলতে হয়।

রাত হতে এখনও অনেক বাকি! ও তাই এখনও ঘুমিয়ে।


আপনার সজাগ
দেহরক্ষীকে চিনুন
CINTHOL
DEODORANT AND COMPLEXION SOAP
CINTHOL
সিন্থল···৩০ বছরেরও বেশীকাল ঘরে-ঘরে বিশ্বস্ত নাম—
সারা পরিবারের সবারই প্রিয় সাবান, যা ত্বকের দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী
জীবাণু নাশে অদ্বিতীয়।
এটি আপনার শরীরকে দুর্গন্ধ মুক্ত করে, আপনাকে সারাদিন
তরতাজা রাখে।
এটি শুধু করে না পরিস্কার··· আপনাকে রাখেও চমৎকার।
গোদরেজ
সিন্থল – দুর্গন্ধনাশক সাবান
যে দেহরক্ষীর প্রহরা...
সবার আগেই দরকার!
CHAITRA-B-G-189-BEN

দূরের কাছে

সুনীল দাশ



এই শুরু হল ল্যাণ্ডিং। এয়ার ইণ্ডিয়ার জাম্বো এয়ারক্রাফটের জানলা থেকে একনজর লণ্ডনকে দেখল সুভদ্র। নিচে কুয়াশা থাকলেও লণ্ডনের বর্ণময়তা বোঝা যায়। সবুজ গাছগাছালি আর অজস্র প্রাসাদ-চুড়োর দৃশ্যপটে বয়ে যাচ্ছে টেমস।

হিথরো এয়ারপোর্ট চোখের সামনে ক্রমশ বড় হতে হতে প্লেন মাটি ছুঁলো। সুভদ্রর ছোট্ট অ্যাটাচিতে সব গোছানো আছে। তাহলেও এক ধরনের চাপা উদ্বেগ থাকে। ক্যাথারিন মেহেরার ফোন নম্বর, হিথরো থেকে ভদ্রমহিলার বাড়ি যাওয়ার জন্যে পথের নির্দেশ—সবই আছে। তবু। সে লণ্ডনে প্রথম এলো শুধু তাই নয়, এই প্রথম তার ভারতবর্ষের বাইরে পা দেওয়া। সেমিনার শুরু হতে দুটো দিন বাকি এখনো।

দমদম, সান্তাক্রুজ বা পালাম দেখে হিথরোর কর্মব্যস্ততা কল্পনাও করতে পারেনি সুভদ্র। কয়েক পলক সে স্থির হয়ে দেখল একনজরে বিশাল এই এয়ারপোর্টের যতটুকু দেখা যায়। সিকিউরিটি চেক সমেত পুরো ব্যাপারটা শেষ করে বের হয়ে আসতে এমন কিছু বেশি সময় লাগল না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল লাগেজ বেল্ট ঘুরছে যেখানে সেই দিকে। নিজের স্যুটকেস নামিয়ে সে এগিয়ে এল টেলিফোন বক্সগুলোর দিকে।

কয়েন ফেলে ক্যাথারিন মেহেরার নম্বর একবার ঘোরাতেই পেয়ে গেল লাইন। ভদ্রমহিলাই কথা বলছেন। কণ্ঠে অভ্যর্থনার উষ্ণতা। ক্যাথারিনের সুরেলা ইংরেজি তাঁর বয়সের ভারে খানিকটা মাধুর্য হারালেও

শুনতে ভাল লাগছিল সুভদ্রর। উনি জানালেন, 'আমার মেয়ে জুলি যাচ্ছে তোমাকে আনতে, তুমি কথা বল জুলির সঙ্গে।'

এবার ওপাশ থেকে একটি তরুণীর গলা, 'সুপ্রভাত, আমাদের প্রিয় অতিথি। আমি আপনাকে আনতে যাচ্ছি। দয়া করে আপনার পোশাকের বর্ণনাটা করলে, আপনাকে চট করে বার করে নিতে সুবিধে হবে।' ইংরেজি ভাষার স্বভাব সৌজন্যের জন্যেই হোক বা জুলির মূল বক্তব্যের জন্যেই হোক কথাগুলোর মধ্যে ভদ্রতার এতটুকু ঘাটতি নেই। তবু ক্যাথারিন মেহেরার বয়স্ক কণ্ঠেও যে উষ্ণতা ছিল এই তরুণীর গলায় সেটাও যেন পেল না সুভদ্র। প্রথমেই কেমন খটকা লাগল তার।

সুভদ্র বলল, 'আমার স্যুটের রঙ হালকা বাদামি। মাথায় টুপি নেই। কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। হাতে নীল রুমাল। আমি এয়ার ইণ্ডিয়ার কাউণ্টারটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।'

'ঠিক আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে যাচ্ছি আমি। ঘন গোলাপি লঙ কোর্ট থাকবে আমার গায়ে। ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ' জানিয়ে সুভদ্র রিসিভার নামিয়ে দেয়।

হয়ত ব্যাপারটা আদৌ তা নয়। এক একজনের বলার ধরনের মধ্যেই কেমন যেন যান্ত্রিকতা থাকে। কিংবা এমনও হতে পারে জুলির হয়ত জরুরী কোনো কাজ ছিল অথবা কোনো বন্ধুর সঙ্গে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল ; তার জায়গায় মা-র অনুরোধে বিমান বন্দরে আসতে হচ্ছে একজন ভারতীয়কে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। বাবার দিক থেকে জুলির রক্তে ভারতীয়তা থাকলেও ও হয়ত কালোমানুষ একেবারেই পছন্দ করে না। পর পর অনেকগুলো কথা হয়ত সাজাতে সাজাতে সুভদ্র হঠাৎ নিজেকেই নিজে বলল, ধ্যাৎ এসব ভাবার কোনো মানে হয় না। একটু পরেই তো বোঝা যাবে সব।

জুলি বলেছিল আধ ঘণ্টা কিন্তু আরও বেশ কিছুটা সময় লাগল জুলির পৌঁছতে। বেশ খানিকটা দূর থেকেই সুভদ্র চিনতে পেরেছে জুলিকে। সোজা সে সুভদ্রর দিকে এগিয়ে আসছে। জুলি রীতিমত সুন্দরী। নীল চোখ।

'আমি জুলি মেহেরা। নিশ্চয়ই প্রফেসর রায়ের সঙ্গে কথা বলছি।' সেই একই চরিত্রের কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট এবং নিরুত্তাপ। ভদ্রতার অভাব নেই কিন্তু তার বেশি নয়।

'কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আমার জন্যে এতটা পথ কষ্ট করে আসতে হল।' সুভদ্র খুব সহজ গলায় বলল।

'আমায় দেখে কি মনে হচ্ছে খুব কষ্ট করে এলাম?' প্রশ্নটা ছু'ড়েই জুলি বলল, 'আশা করি তোমার যাত্রাপথ বেশ নির্বিঘ্ন ছিল।'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর এসেছি। আগাগোড়া পরিষ্কার আকাশ। আচ্ছা, আমরা কি এক কাপ কফি খেয়ে নিতে পারি?'

স্পষ্ট বোঝা গেল এয়ারপোর্টের রেস্টুরেন্টে বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার কোনো রকমের আগ্রহ নেই জুলির। তবু সরাসরি 'না' বলল না। শুধু বলল, 'আমরা এখানে বেশি দেরি করব না। মা আবার অস্থির হয়ে উঠবে।'

চেয়ারে বসে জুলি সিগারেট বার করল। সুভদ্রর দিকে এগিয়ে দিল খোলা প্যাকেট। সুভদ্র একটা তুলে নিয়ে ঠোঁটে রাখলে জুলি লাইটার জ্বেলে সুভদ্রর সিগারেট ধরিয়ে দিল। তারপর ধরাল নিজের সিগারেট।

সুভদ্র ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কিছুদিন আগে তোমার মা-র একটা ফটোগ্রাফ দেখেছি আমি, হালের তোলা ফটো। তুমি তোমার মা-র রূপ পেয়েছ।'

সামান্য হাসি এ প্রসঙ্গ মিটিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায়। জুলি ঠোঁটের কোণে হাসি ভাঙল একবারটি। এই মুহূর্তে সুভদ্রর মনে হল ক্যাথারিন এবং জুলি সম্পর্কে সে নিজে খুব সামান্যই জানে। জানা উচিত ছিল। যার একান্ত আগ্রহে অতিথি হয়ে



কয়েকটা দিন থাকার পরিকল্পনা সে করেছে তার সেমিনারে আসার সুযোগে—সেই ভদ্রমহিলা সম্পর্কে আরও কিছু কথা অনায়াসে বাবার কাছ থেকে জেনে আসতে পারত সুভদ্র। নেপথ্যের ইতিহাসটুকু ভাল করে জানা থাকলে নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে অনেক সহজ হয়।

'তুমি তো সম্প্রতি চাকরিতে ঢুকছ'

'চাকরি আমি অনেকদিন করছি। সম্প্রতি ঢুকেছি নিউজ পেপারে'।

'ইণ্ডিয়া ট্যুরে যাবে কবে'

'যাবই যে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তবে যেতেও পারি। আমার মা-র মত আমার কোনো আধ্যাত্মিক টান নেই।'

'আধ্যাত্মিক টান?'

'ছিল না। কয়েক বছর হল হয়েছে।'

এরপর কিছুক্ষণ কোনো কথা নেই। প্রতিবারই সুভদ্র প্রশ্ন করছিল। যেন সেটা ভাঙতেই জুলি এবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার বাবার শরীর কেমন আছে?'

'মোটামুটি ভালই। প্রেসারটা আছে। আসলে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন তো!'

'আমার মায়েরও ঠিক তাই। বাইরে থেকে তত বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে একা হয়ে পড়েছে।' কথাটা জুলি খানিকটা যেন নিজের মধ্যে বলার মত করে বলল।

সুভদ্র এবার একটু নামানো গলায় বলল, 'কেমন একই অবস্থা দুজনের'।

'হ্যাঁ, আমার বাবা মারা গেছেন দু বছর হল আর তোমার মা-র মৃত্যু বোধহয় একবছরও হয়নি—তাই না?'

'হ্যাঁ, সামনের নভেম্বরে, সেভেনথ নভেম্বর এক বছর পুরো হবে।' আবার স্তব্ধতা এসে গেল। পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার ফাঁকে সুভদ্র বার কয়েব দেখল জুলিকে। জুলি একবারও তাকাল না তার দিকে। নিস্তরঙ্গ দুটি নীল চোখের দৃষ্টি।

এক সময় সুভদ্র বলল, 'তুমি যে তোমার মা-র কাছেই থাক এটা আমার জানা ছিল না।'

'কি জানা ছিল?'

'আসলে তোমার সম্পর্কে তেমন কোনো কিছুই জানা নেই আমার।'

'একই অবস্থা আমারও। কদিন ধরে মা যদিও বারবার তোমার কথাই বলছে।'



কফি শেষ করে ওরা দুজনে বেরিয়ে এল এয়ারপোর্ট থেকে। গাড়ি এনেছে জুলি। নিজে চালকের আসনে বসে সে দরজা খুলে সুভদ্রকে তার পাশের আসনে বসাল। সুভদ্র স্যুটকেস আর অ্যাটাচি রেখেছিল পেছনের আসনে।

এখন বেলা অনেকটা এগিয়েছে। অক্টোবরের শুরু। ফিকে কুয়াশা ছড়ানো চারিপাশে। রোদ ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। কিছুক্ষণ কথা না বলে সুভদ্র দু পাশের বাড়ি, দোকান, গাছপালা, মানুষজন দেখল। জুলিকেও দেখল অনেকবার। কোনো মানুষ, বিশেষ করে কোনো তরুণী আলাপের সূচনা থেকেই এভাবে নিছক ভদ্রতায় নিরুত্তাপ থাকলে পরিবেশটা সহজ হয়ে ওঠে না কিছুতেই।

সুভদ্র বলল, 'লণ্ডন এমন একটা শহর, যাকে প্রথম দেখার আগেই মনে হয় অনেকবার দেখা হয়ে গেছে। আসলে গল্প উপন্যাসের পাতায়, ফিল্মে -লণ্ডনকে কতবার যে দেখেছি তার তো হিসেব নেই।'

'লণ্ডনের একটা বিশেষ গুণ আছে, এখানে বাইরের লোক মিশে যায় সহজে'

'কলকাতাও তাই' বলতে গিয়ে ক্যাথারিনের কথা ভেবে চুপ করে যায় সুভদ্র।

দুই

উইলেসডেনগ্রীন। টিউব স্টেশন থেকে যে রাস্তাটা এগিয়ে ডান-দিকের চৌমাথায় চলে গেছে—সেই বড় রাস্তার ওপর থেকে অল্প একটু সরু রাস্তা বেয়ে এগোলেই বাঁদিকে পুরনো দোতালা বাড়িটা জুলিদের।

বাড়ির পেছনে একফালি বাগান। ঘন সবুজ ঘাস আর নানান রঙের বাহারী ফুল ভরা সে বাগানে। বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে জুলি আর সুভদ্র যখন বাড়িতে ঢুকল, ক্যাথারিন তখন বাগানে। ওরা এসেছে দেখে উনি উঠে এলেন বাগান থেকে।

হালকা মেরুন রঙের পোশাক ক্যাথারিনের পরনে। চোখে চশমা। মুখের রেখায় বয়স অনেকটা ঝুঁকে এলেও বোঝা যায় একদা সুন্দরী ছিলেন। দুটি নীল চোখ বড় মমতাগভীর।

সুভদ্রর কাছে এসে উনি স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলেন তারপর হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন সুভদ্রকে আর অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, 'আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে বোঝাতে পারব না। পুরো না হলেও তোমার চেহারা অনেকটা তোমার বাবার মত। সেই রকম চোখা নাক, বড় বড় চোখ। আর সবচেয়ে বেশি যেটা—ওই হাসিটা—একেবারে বসান।'

খুশিতে চোখে জল এসে গেছে ক্যাথারিনের। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে নিলেন তাড়াতাড়ি। সুভদ্রকে নিয়ে ঘরে এসে বসতে বসতে বললেন, 'খুব ভাল সময়ে এসেছ তুমি। তোমার সেমিনার শেষ হচ্ছে যেদিন তার পরদিন থেকে জুলিকে ছুটি নিতে বলেছি একটা উইক।'

জুলি সেই সময়টায় কাছে নেই। ওপরের ঘরে গেছে। তবু একটু স্বর নামিয়ে ক্যাথারিন বললেন, 'জুলি একটু মুডি। খুব একটা আলাপী নয়। ওর এমনি ওপর ওপর বন্ধুবান্ধব অনেক আছে। কিন্তু সত্যিকারের বন্ধু একজনও নেই। একটু মানিয়ে নিও।'

সুভদ্র ওর স্যুটকেস খুলে দুটো উপহার বার করল। সুভদ্রর বাবা সুবোধ রায়ের পাঠানো উপহার। ক্যাথারিনের জন্যে কাশ্মীরী কাজকরা চমৎকার একটা শাল আর জুলির জন্যে ইণ্ডিয়ান সিল্ক। ঘন নকশার কাজকরা শালটা দুহাতে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন ক্যাথারিন, 'আমার মনের মত উপহার। সুবোধের ঠিক খেয়াল আছে আমার পছন্দগুলো।'

জুলিকে ডাকতে গিয়ে ক্যাথারিনের খেয়াল হল একটু আগে তিনি জুলিকে ওপরের খাবার টেবিল সাজাবার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সে কথা মনে পড়ায় সুভদ্রকে বললেন, 'চল, ওপরে যাই। আমরা দুজন ওপরেই থাকি। নিচে ওপাশটা জুড়ে ডেণ্টাল হসপিটাল। ডাক্তার মেহেরা আর আমিই এটা চালু করেছিলাম। এখন অন্য লোক দেখাশোনা করে। এসো।'

ওপরে উঠেই ক্যাথারিন জুলিকে দেখিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার উপহার। সুবোধ পাঠিয়েছে। আর আমার জন্যে এই শাল।'

সুভদ্র লক্ষ্য করল ক্যাথারিনের ইংরেজি কথার মধ্যে 'সুবোধ' শব্দটা একেবারে বাংলা উচ্চারণের স্পষ্টতা পেল।

জুলি উচ্ছ্বসিত না হলেও খুশি হয়েছে বোঝা গেল। স্বল্প হাসিহাসি মুখ নিয়ে তাকালও একবার সুভদ্রর দিকে। এটুকুও নিছক ভদ্রতা কিনা বোঝা গেল না।

জুলি বলল, মাম্মি, 'সুভদ্র'কে বরং একেবারে ওর ঘরে নিয়ে যাও। ও 'ওয়াশ করে ড্রেস চেঞ্জ করে আসুক।'

'সেই ভাল।' বলে ক্যাথারিন সুভদ্রকে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। খয়েরি কার্পেটে মোড়া দুহাত চওড়া ছোট্ট একটা সিঁড়ি। বাইরে থেকে বাড়িটাকে দেখে দোতালা মনে হলেও এখন বোঝা যাচ্ছে আড়াইতলা। ওপরে ছোট ছোট ঘর আছে দুখানা। অতিথি এলে ব্যবহার হয়। সব ঘরেই সেণ্ট্রাল হিটিং-এর ব্যবস্থা। সুইচ টিপে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে উষ্ণতা এসে গেল। সুভদ্রর থাকার জন্যে দক্ষিণের ঘরটা। ঘরের দেওয়াল মানানসই রঙিন কাগজে মোড়া। লাগোয়া বাথরুমে গরম এবং ঠাণ্ডা জলের কলবসানো বেসিন।

মাঝারি মাপের একটা জানলা। কাচের পাল্লার ওপর দুটো পর্দা টাঙানো। একটা সাদা পাতলা পর্দা ছোট মাপের। অন্যটা গাঢ় সবুজ রঙের বড় ঝুলের ভারী পর্দা। জানলাটা পুরো খুললে উইলেসডেনগ্রীনের ছোট্ট ওই রাস্তাটার অনেকখানি দেখা যায়।

ক্যাথারিন বললেন, 'তুমি পোশাক বদল করে মুখহাত ধুয়ে নিচে এসো। খেয়েদেয়ে আগে তো একটা ঘুম দিয়ে নাও। তারপর ঘুম থেকে উঠে জমিয়ে গল্প করা যাবে। জুলি অবশ্যি বেরোবে কিছুক্ষণের জন্যে!'

সুভদ্র হাতঘড়ি খুলতে খুলতে বলল, 'ঠিক এই সময়টায় কলকাতায় সবাই ঘুমোচ্ছে। আমার চোখেও বেশ ঘুম টের পাচ্ছি।'

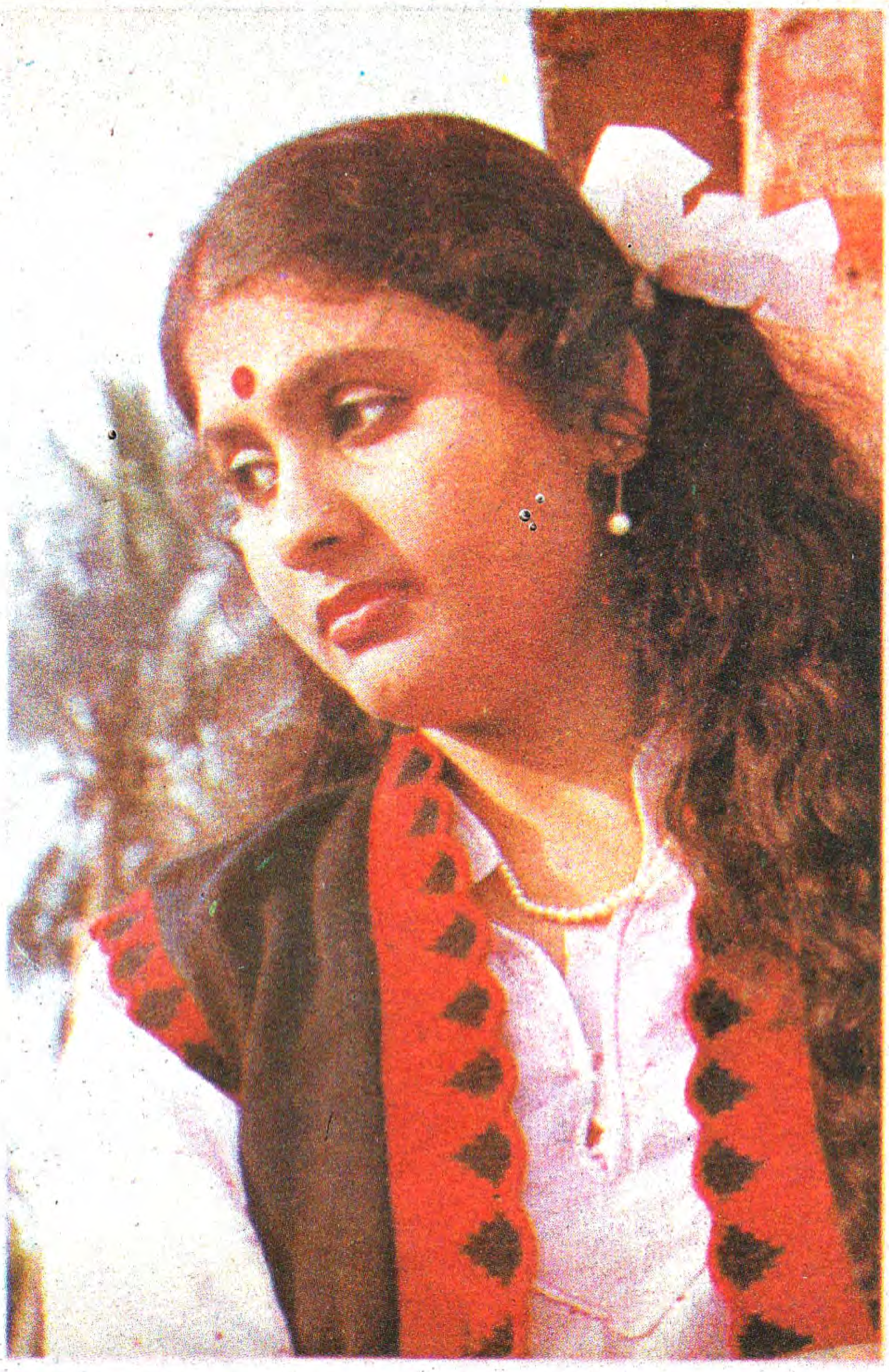
'হ্যাঁ ওখানকার ঘুম এবং জাগার অভ্যেসকে এখানে মানিয়ে নিতে দু একদিন লাগবে।'

'তারপর অভ্যেসটা যখন জমে বসবে তখন কলকাতায় ফিরে আবার নতুন করে অভ্যেস তৈরি করতে আরো একবার গণ্ডগোল!' বলে সুভদ্র হাসল।

[এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়]

শীতের পোশাক





উত্তরে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে শীতের পোশাকের ভাবনা। শীতকে মানিয়ে কিভাবে পোশাককে রমণীয় করা যায় তারই চিন্তা চলতে থাকে। শাল, স্কার্ফ, কার্ডিগান, পঞ্চ, আলোয়ান সবেরই নানা বৈচিত্র্য। সূক্ষ্ম কাজকরা কাশ্মীরী শাল, কুরুশের বোনা স্কার্ফ বা হালফ্যাশনের কার্ডিগান পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে পরাটাই সাজের বৈশিষ্ট্য

ফটো ঃ অর্ধেন্দু রায়





দূষিত ত্বক ও তার সুরক্ষা (১)

ইতিপূর্বে মুখমন্ডলের কিছু ব্যায়ামের বিষয়ে বলা হয়েছে। উল্লিখিত ব্যায়ামগুলো ছাড়াও মুখের আরো নানাবিধ ব্যায়াম আছে। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে সে-সবের উল্লেখ করা যাবে, কিন্তু আপাতত যেগুলোর কথা বলা হয়েছে সে কটা নিয়মিত অভ্যাস করলেই পর্যাপ্ত উপকার পাবেন। এবার ত্বকের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে হানিকর কিছু সাধারণ সমস্যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও তার সমাধানের আলোচনায় মন দেওয়া যাক । কৈশোর ও যৌবনে, যখন ত্বক থাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান, ঠিক তখনই সমস্যাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সব বয়সেই শরীরের আলাদা আলাদা সমস্যা থাকে, সেই হিসেবে এটা নব-যৌবনের সমস্যা। এদের মধ্যে প্রধানতম হলো Pimples, Acne Black heads এবং White heads। আপনি যদি আপনার ত্বক নিয়মিত যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পরিচ্ছন্ন রাখেন, সুষম খাদ্য-তালিকায় বাঁধা আহার গ্রহণ করেন, নিয়মিত ব্যায়াম করেন এবং যথাসম্ভব স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে জীবন ধারণ করেন তবে আপনার ত্বকের এই ধরনের যাবতীয় সমস্যাকে সহজেই জয় করতে পারবেন। অন্যথায় ত্বকের জটিল ও গুরুতর সমস্যায় আপনাকে জর্জরিত হতেই হবে। বহু-ব্যবহৃত পুরনো সেই ইংরেজী প্রবাদটিই চিরন্তন সত্য - "An ounce of prevention is worth a pound of cure."

ব্রণ (Pimples)ঃ প্রধানত কিশোরী ও পূর্ণ-যুবতী মেয়েদের মুখে ছোট বড় নানা ধরনের ফুসকুড়ি হতে দেখা যায়। প্রায় সময়ই তাতে আবার পুঁজ জমে ওঠে। ব্রণ হওয়ার কারণ প্রধানত অত্যধিক তেল-মশলা যুক্ত খাবার খাওয়া, ঠিকমতো পেট পরিষ্কার না হওয়া, কারণ বা অকারণেই হোক অত্যধিক পরিশ্রম বা শরীরের অতিরিক্ত অত্যাচার-জনিত ক্লান্তি বা অবসন্নতা এবং যত্ন ও মনোযোগ সহকারে মুখ না ধোয়া প্রভৃতি। এ ছাড়া ব্ল্যাক হেড্‌স্ থেকে সংক্রামিত হয়েও মুখে নিত্যনতুন ব্রণর জন্ম হয়। অবশ্য সংক্রামক বলতে ঠিক এই নয় যে, ব্ল্যাক হেড্‌স্-এর অধিকারী বা অধিকারিণী অপর কোনো পুরুষ বন্ধু বা বান্ধবীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এলেই তা থেকে আপনার মুখে ব্রণ সংক্রামিত হবে। সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। আসলে আপনার মুখে যদি ব্ল্যাক হেড্‌স্-এর আবির্ভাব ঘটে তবে তা থেকে মুখমন্ডলের ত্বক দূষিত হয়ে ব্রণর জন্মের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি হয়। যখনই মুখে ব্রণর জন্ম হয়, সব মেয়েই তা নিয়ে কমবেশি খোঁটাখুঁটি শুরু করে দেন। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই হাত দিয়ে ব্রণ গালবার চেষ্টা বা খোঁটাখুঁটি করা উচিত নয়। এই রোগ আপনার মুখে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সেটাও একটা কারণ। ব্রণ হলে তার চারপাশ সর্বদা নিয়ম করে খুব পরিষ্কার রাখবেন এবং ক্যালামাইন (Calamine) লোশন বা মলম লাগাবেন। ক্যালামাইন শুধু ব্রণই নয়, আপনার ত্বকের অন্যান্য নানা প্রকার জ্বালা সৃষ্টিকারী স্ফীতিকেই শুকিয়ে তুলবে। এছাড়া Epsom salt গরম জলে গুলে মোটা করে তুলো অথবা নরম কোনো কাপড় ভাঁজ করে তা দিয়ে সেক দেবেন। আজকাল বাজারে ব্রণ উপশমের জন্যে নানা প্রকার ক্রীম, মলম ইত্যাদি পাওয়া যায়, ইচ্ছে করলে শুধু তারও একটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। যদি প্রকৃত উপকার পান তাহলে সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। তবে সে সম্ভাবনা ক্ষীণ বলেই মনে করি।

অ্যাকনি (Acne)ঃ মাঝে মাঝে ব্রণর মতোই ফোসকা জাতীয় এক ধরনের স্ফীতির জন্ম হয় মুখে। এই স্ফীতি ঘায়ের মতোই কিছুটা রক্তিম ও জ্বালা-ধরা। একে বলা হয় অ্যাকনি। ব্রণর মতো কেন্দ্রীভূত দানা দানা ফুসকুড়ি হয়ে না থেকে সাধারণত মুখমন্ডলের ত্বকে অধিকতর অংশে ছড়িয়ে পড়ে লালচে, ফোলা ফোলা, জ্বালা ধরা ক্ষতের মতো চেহারা নেয়; এতেও প্রায়ই অল্প অল্প পুঁজ হতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য এটা একেবারেই তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যা বলে কিশোরী ও নব-যৌবনাদের মুখেই প্রধানত এসব হতে দেখা যায়। কারণ আগেই বলা হয়েছে এ বয়সে অতিরিক্ত সজীব তৈল-গ্রন্থি এবং লোমকূপের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ বা থলি, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় hair follicles সে সব থেকে অনবরত ও বেশি মাত্রায় তেল প্রবাহিত হতে থাকে। বায়ুমন্ডল-বাহিত অবিশ্রান্ত অতি সূক্ষ্ম ধুলো ময়লার কণা সেই তেল-প্রবাহের সঙ্গে মিশে ক্রমশ তেল-চিটচিটে আঠার মতো পুঞ্জীভূত হয়ে ত্বকের ছিদ্রপথগুলো বন্ধ করে তেলের স্বাভাবিক প্রবাহকে রুদ্ধ করে দেয়। আর তখনই শুরু হয় যাবতীয় সমস্যা। এ বিষয়ে নানা জনের বিভিন্ন উপদেশে বিভ্রান্ত না হয়ে বা এসব রোগকে একটুও উপেক্ষা না করে প্রথম অবস্থাতেই অ্যাকনি নির্মূল করার জন্যে বিশেষ মনোযোগ দিন; অন্যথায় আপনি হয়তো আপনার সুন্দর মুখে চিরকালের জন্যে গর্ত গর্ত পুরনো ঘায়ের দাগের মতো ক্ষত সৃষ্টি করবেন। তখন একমাত্র প্লাসটিক সার্জারি ছাড়া যা সারিয়ে তোলা আর কোনো ডাক্তারি শাস্ত্রের দ্বারা সম্ভব হবে না। সুতরাং অ্যাকনির সম্ভাবনা দেখা দিলে কালবিলম্ব না করে মুখ ধোয়াধুয়ি করা এবং পরিচ্ছন্ন রাখা বিষয়ে মনোযোগ দেবেন। খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরিমিত ও সুষ্ঠু আহার আপনাকে সুফল দেবে। এছাড়া পর্যাপ্ত ঘুমেরও প্রয়োজন। উদাসীনতা ও আলস্য ত্যাগ করে নিয়মিত ব্যায়াম করলেও দ্রুত সেরে উঠবেন। নিয়মিত দিনে অন্তত দু'বার গরম জলে মোলায়েম ও বিশুদ্ধ কোনো সাবান দিয়ে মুখ ধোবেন। সেই জলে কয়েক ফোঁটা বেন্‌জোইন (benzoin) ফেলে ভেষজ রঙের ছোঁয়া, ইংরেজীতে যাকে বলে tincture, দিয়ে নিলে আরো ভালো হয়। মুখে পর্যাপ্ত সাবানের ফেনা তুলে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে তাকে বসে যেতে দিন, তারপর প্রথমে উষ্ণ ও পরে ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নরম পরিচ্ছন্ন তোয়ালে দিয়ে ভালো করে ত্বক শুকিয়ে নিন। ঠোঁটে লিপস্টিক বা চোখে পেনসিলের টান ছাড়া অন্যান্য মেক-আপ, এমনকি পাউডারও যতটা সম্ভব কম ব্যবহার করবেন। এক্ষেত্রে ত্বক শুষ্ককারী কোনো অ্যান্টিসেপ্টিক লোশন ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। মনে রাখবেন অ্যাকনি হচ্ছে ব্ল্যাক হেড্‌স্-এরই জটিলভাবে বেড়ে ওঠা পরবর্তী অবস্থা। সম্ভব হলে প্রচুর দুধ খাবেন। একই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জল পানেরও অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। বেশি করে ফল ও শাকসবজি খাওয়া খুব ভালো। যে-সব খাবার চর্বিযুক্ত বা গুরুপাক সে-সব একেবারেই খাবেন না। মিষ্টিও যতটা সম্ভব না খাওয়াই ভালো। খোলা হাওয়ায় যতটা থাকবেন ততই উপকার পাবেন। রোদে গা পুড়িয়ে (Sun burn) ঘুরে বেড়ালেও এক্ষেত্রে খুব ভালো ফল পাওয়া যায় - সূর্যরশ্মির সরাসরি উত্তপ্ত স্পর্শে অ্যাকনি দ্রুত শুকিয়ে আসে। সূর্যের কিরণের অতি-বেগুনী আলোক-রশ্মি (ultra violet ray) দ্বারা সহজে রোগ উপশমের জন্যেই Sun lamp ব্যবহারের পদ্ধতি ও চিকিৎসার উদ্ভব হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির চেয়ে সরাসরি রোদে গা পুড়িয়ে ঘুরে বেড়ানো কম উপকারী নয়।

চিত্ররথ দত্ত

খুঁটিনাটি

১। যদি মাছি আপনাদের বিরক্ত করে তাহলে কোনো লোহার জিনিস গরম করে তাতে একটু কর্পূর দিয়ে দিন। মাছি পালিয়ে যাবে।

২। পাতিলেবু কাজে লাগাবার পর তার খোসাটা ফেলবেন না। তাকে শুকিয়ে মিহি গুঁড়ো করে দাঁত মাজবেন। তাহলে দাঁত খুব পরিষ্কার হবে আর মুখে দুর্গন্ধ থাকবে না।

৩। ঘরে ছারপোকা হলে ফিটকিরি গরম জলে গুলে খাটে ঢেলে দিন। ছারপোকা থাকবে না।

৪। ঘরে আরশুলার উপদ্রব হলে, যেসব জায়গায় আরশুলা থাকে সেখানে নুন ছড়িয়ে দিন। এদের উপদ্রব কিছুটা কমবে।

৫। যখন তরিতরকারি কাটবেন তখন হাতে আনাজের কষের দাগ হলে একটুকরো পাতিলেবু নিয়ে হাতে ঘষুন। কয়েক মিনিট পরে হাত ধুয়ে ফেলুন। হাত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

৬। বর্ষাকালে কিছুক্ষণ দরজা-জানলা বন্ধ থাকলে ঘরে দুর্গন্ধ হয়। ঘরের কোনায় কর্পূর ছড়িয়ে রাখুন। গন্ধের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।

৭। হ্যারিকেনের তেলে একডেলা নুন ফেলে দিলে তেল কম পুড়বে। আর আলোও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হবে।

রীতা দাস

“নতুন দ্য শীন–
বয়নশিল্পকে
পৌঁছে দিয়েছে
ললিতকলার পর্যায়ে!”



"ক্রেপ দ্য শীন, অর্থাৎ চীন দেশের ক্রেপ—যা চিরকাল হয়ে এসেছে—উচ্চতম শ্রেণীর আসল রেশমের বিলাসিতার প্রতীক! ১০০% পলিয়েস্টারে আমরা দ্য শীন শ্রেণীর ক্রেপ তৈরীর প্রেরণা পেয়েছি— পরম্পরাগত চীনা ক্রেপ থেকে!

বহু হাজার বছর ধরে রেশম পরবার পর, চীনের রাজবংশকে তার তাঁতিরা দিতে সক্ষম হয়েছে— রেশমের এক অভিনব বরদান— ক্রেপ দ্য শীন! সেই থেকে ক্রেপ হয়ে এসেছে, তাঁতি আর তাঁতের সেরা কৌশল আর কারিগরীর নিদর্শন!

ভারেলিতে আমাদের নতুন বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্রে, প্রতি আট জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তাঁতির একজন লাভ করে—দ্য শীন-এর তাঁতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব! এ কাপড় তৈরীর কৌশল খুবই গুরুতর! প্রথমে, লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি টানা



সুতোগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আরোপ করতে হয়। তারপর কঠিন কৌশলে তৈরী হয় এদের সমন্বয়! এরই ফলে ক্রেপ দ্য শীন-এ দেখা দেয় আলোছায়ার খেলা··· রূপের মেলা! সাদরে জড়িয়ে থাকে সারা অঙ্গে, পিছলে খসে পড়ে না। এর চাপা-চমক আর স্বাভাবিক 'ফল' দেখলে, আসল সিল্কের সঙ্গে এর তফাৎ বোঝা যায় না!

উৎকৃষ্ট দ্য শীন তৈরী সহজ কাজ নয়, তবু এই পথেই আমরা চলবো নিশ্চয় — কেনই বা চলবো না? ভারতীয় নারীর গরিমার উপযুক্ত কাপড়ই তো তৈরী করছি, তাই না?"

প্রফুল্ল এ শাহ্, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, গার্ডেন সিল্ক মিল্‌স প্রা. লিঃ; চেয়ারম্যান, ভারেলী গ্রুপ।

Rediffusion/G/2581 g BN

স্বাস্থ্যবতী মা ও সুস্থ সন্তান

বিনোদ কুমার



অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে গর্ভবতী মায়েদের মৃত্যুর হার আট থেকে দশগুণ বেশি। সুষম খাদ্যের অভাব, প্রাক-প্রসবকালীন যথাযথ যত্নের অভাবে মায়েদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অন্তঃসত্ত্বা মায়েদের পেশীকলার ক্ষয়, অপরিণত শিশুর জন্ম, তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকৃতি শিশু, গর্ভপাত, গর্ভস্রাব, দীর্ঘস্থায়ী প্রসববেদনা ইত্যাদি নানান জটিলতা দেখা দেয়। এদেশে গ্রাম শহর নির্বিশেষে সামাজিক অর্থনৈতিক বিচারে নিম্নস্তরের মানুষদের মধ্যে ব্যাপক অপুষ্টি বিদ্যমান। ভারতে সন্তানধারণে সক্ষম মায়েদের দেহের ওজন নিতান্তই কম, উনচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ কিলো-গ্রামের মধ্যে। গর্ভাবস্থায় এই ওজন গড়ে মাত্র চার থেকে ছয় কিলোগ্রাম বৃদ্ধি পায়।

গর্ভবতী মায়েদের সন্তানধারণের জন্য দেহাভ্যন্তরস্থিত নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলির বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন। এর দ্বারা ক্রমবর্ধমান ভ্রূণের স্থান সঙ্কুলান এবং পরবর্তীকালে দুগ্ধদানের প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্তনের পেশীকলার বৃদ্ধি, নবগঠিত পেশীকলাতে সরবরাহের প্রয়োজনে সঞ্চলমান রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

খাদ্যে লৌহজাতীয় পদার্থের অভাব মা ও শিশুকে রক্তাল্পতার শিকার করে তোলে। এটা বিশেষ করে ঘটে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার তিন মাসের সময়ে। রক্তাল্পতার কিছু লক্ষণ হল – ক্ষুধামান্দ্য, অল্পে অবসাদ এবং ফেকাসে ভাব। অবহেলিত রক্তাল্পতা রোগ শিশুর সমকালীন ওজনহ্রাস, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে। সুষম খাদ্যের অভাব ভিটামিন এ এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবের কারণ হতে পারে, যার ফলে মায়ের অস্থি-সংক্রান্ত রোগ নবজাতকের দুর্বল অস্থিবিন্যাস ঘটাতে পারে। গর্ভাবস্থায় মাকে সুষম খাদ্য যোগানো একান্ত কর্তব্য।

অন্যান্য শক্তিবর্ধক খাদ্যের (যথাঃ দানাশস্য, চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাদ্য, শর্করা ইত্যাদি) পরিমাণ বৃদ্ধি না করে অন্তঃসত্ত্বা নারীকে অধিকতর পরিমাণে পেশীবর্ধক খাদ্য (যথাঃ দুধ, দই, নানা রকমের ডাল, বাদাম ও মাংসজাতীয় খাদ্য) এবং প্রতিরোধক খাদ্য (যথাঃ নানাজাতের ফল, সবুজ পাতাযুক্ত সবজি এবং অন্যান্য সবজি) অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। ডাল বা দানাশস্য গ্রহণের পূর্বে অঙ্কুরিত করে নেওয়া যেতে পারে। এতে খাদ্যের স্বাদ-গন্ধ উন্নত হয়, খাদ্য সহজপাচ্য হয় এবং পুষ্টিগত মান বৃদ্ধি পায়। মাংসজাতীয় খাদ্যের মধ্যে যেগুলি সুলভ, যেমন যকৃত বা মেটে (liver), বৃক্ক (kidney) এবং ছোট অল্পদামী মাছ খেতে দেওয়া যায়। গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে একশ মিলিলিটার দুধ খাদ্য তালিকায় থাকা প্রয়োজন। পাতাযুক্ত সবজি প্রতিদিন সম্ভব না হলেও সপ্তাহে তিন-চারবার খাওয়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট পরিমাণে দুধ খাওয়ানো সম্ভব না হলে আরও একদফা বেশি ডাল, টাটকা শাকসবজি এবং ফলমূলাদি দেওয়া যেতে পারে। যে সবজিগুলো কাঁচা বা স্যালাড হিসাবে খাওয়া যায় সেগুলোর পুষ্টিগত মান রান্না করা সবজির তুলনায় অনেক বেশি। কোনো একটি বিশেষ দ্রব্যের উৎসের উপর নির্ভর না করে গর্ভবতী নারীকে বিভিন্ন দানাশস্য মিশিয়ে খেতে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। জোয়ার এবং বাজরা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ। ঢেঁকি বা কলে-ছাঁটা সিদ্ধ চাল কলে-ছাঁটা আতপচাল থেকে অধিকতর পুষ্টিকর। অল্প পরিমাণ চর্বি বা স্নেহজাতীয় পদার্থ



শক্তি যোগানোর জন্য এবং ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। তালমিছরি বা তালের রসজাত চিনি শুধু সস্তা নয়, রক্তবর্ধক, পুষ্টিকর। আখের চিনিতে যার নিতান্ত অভাব। অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা অধিক পরিমাণে আচার বা চাটনিজাতীয় খাদ্য এবং তীব্র গন্ধযুক্ত খাদ্য পরিহার করবেন। অন্যান্য পানীয়ের সঙ্গে চার থেকে ছয় গ্লাস পরিশুদ্ধ জল পান করবেন, এতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে এবং বৃক্ক (kidney) ও মূত্রাশয়ের সংক্রমণ প্রতিহত হবে।

শিশুদেহের চর্বি ও দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণের (soluble vitamin) ভান্ডার গর্ভবতী মায়ের খাদ্যের সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কযুক্ত। গর্ভবতী মায়ের ওজন বৃদ্ধি গর্ভাবস্থার চল্লিশতম সপ্তাহে সাড়ে বার কিলোগ্রাম পর্যন্ত হতে পারে। অপর্যাপ্ত খাদ্য অথবা মাত্রাতিরিক্ত কাজের চাপ চর্বি না জমার হেতু এবং এটাই ওজন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। স্তন্যদানের ফলেও মায়ের পেশীকলার ক্ষয় ঘটে। কোনো কোনো পুষ্টির দ্রুত ক্ষতিপূরণ সম্ভব (যথাঃ ভিটামিন 'সি')। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্যালোরি এবং প্রোটিনের ক্ষেত্রে ক্ষয় পূরণ হতে মাসের পর মাস লেগে যেতে পারে।

পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যাপক মিশ্রণ এবং অন্যান্য খাদ্য-বিকল্পের যোগান গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানের সময় মায়ের ওজন বৃদ্ধিতে, পুষ্টি সঞ্চয়ে সাহায্য করতে পারে। অবশ্য ওই খাদ্য সহজলভ্য এবং গ্রহণীয় হওয়া প্রয়োজন।

একজন গর্ভবতী নারীকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য অবশ্যই প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে নিয়মমত হাজিরা দিতে হবে। লৌহ এবং ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট (রক্তাল্পতার ওষুধরূপে ব্যবহৃত বৃক্ষপত্রাদি থেকে প্রাপ্ত ভিটামিন-যুক্ত অম্লবিশেষ) এসময় তার নিয়মিত খাওয়া উচিত। এই ওষুধ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র অথবা প্রসবকালীন সাহায্য-কারী ধাত্রীর কাছে প্রাপ্তব্য। প্রসবের সময় যে মায়ের অস্ত্রোপচার হয়েছে, তাঁকে তরল খাদ্য (ফলের রস) অথবা নরম খাদ্য (দানা শস্য, সিদ্ধ ও চটকানো সবজি) ইত্যাদি অস্ত্রোপচারের তৃতীয় দিন থেকে দেওয়া যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা অপেক্ষা স্তন্যদানের সময় মায়ের উপর বেশি চাপ সৃষ্টি হয়, কেননা শিশু ততদিনে পুনর্গঠিত হয়েছে, দ্রুত বেড়ে চলেছে। প্রতিদিন তাঁর খাদ্যের প্রয়োজনও এসময় বেড়ে চলে। গর্ভাবস্থায় সন্তোষজনক সুষম খাদ্যগ্রহণ পরবর্তীকালে শিশুকে স্তন্যদানের সাফল্যের পক্ষে উপযোগী। গর্ভবতী মায়ের খাদ্য এবং তরল পদার্থ গ্রহণের পরিমাণ পরবর্তীকালে বুকের দুধ দেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা জানা গেছে যে-মায়েরা গর্ভাবস্থায় পুষ্টিহীনতায় ভোগেন, তাঁরা শিশুকে তিন-চার মাসের বেশি স্তন্য যোগাতে পারেন না। পক্ষান্তরে যেসব মায়েরা যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করেছেন, তাঁরা সাধারণত শিশুকে ছয় মাস ধরে বুকের দুধ যোগাতে পারেন। কোলাস্ট্রামের মধ্যে ইমিউনোগ্লোবিনের কেন্দ্রীভবন পরিমাপ করে দেখা গেছে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক পশ্চাৎপটের বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন মায়ের বুকের দুধ একই রকম, এবং মোটামুটিভাবে কয়েক মাস ধরে একই রকম থাকে। অবশ্য মায়ের অপুষ্টি দুধের সামগ্রিক উৎপাদনকে কমিয়ে দেয়, যদি-না সেই সঙ্গে পরিপূরক খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

স্তন্যদাত্রী মায়ের উচিত তাঁর খাদ্য-তালিকায় পেশীবর্ধক এবং প্রতিরোধক খাদ্য ছাড়াও অধিকতর পরিমাণে শক্তিবর্ধক খাদ্যের বন্দোবস্ত রাখা। এতে স্তন্যদুগ্ধের উৎপাদন এবং নিঃসরণের প্রাচুর্য নিশ্চিত হবে এবং পুনরুদ্দীপ্ত শারীরিক কার্যকলাপের দাবি মেটানো সম্ভব হবে।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদুগ্ধ সঞ্চয়ের সময়ে অনুকূল এবং আশানুরূপ খাদ্যের সরবরাহ তুলনামূলকভাবে সুস্বাস্থ্যের শিশুর জন্ম ও বিকাশে সহায়তা করে।

ফটো : সুজিত সেনগুপ্ত



তিন কন্যার গল্প

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

"এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, আরেক কন্যা খান, আরেক কন্যা গোঁসা করে ।" আজকের কন্যাদের কাজকর্মের চৌহদ্দি শুধু এইটুকুর মধ্যে আর আবদ্ধ নেই। তাঁরা রাঁধেন ঠিকই, খানও নিশ্চয়ই এবং মাঝে মাঝে কি আর গোঁসাও করেন না! কিন্তু তাঁদের আসল পরিচয় অন্য। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ আজকাল গভীর। এমনই তিন কন্যার সঙ্গে আলাপ হল সেদিন। এঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয়, তবে আপাতত আমেরিকার বাসিন্দা, প্রত্যেকেই বিবাহিতা এবং কর্মরতা। মার্কিন দেশে ভারতীয় উচ্চশিক্ষিতা, চাকুরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর মহিলার অভাব নেই। আমি খুঁজছিলাম কয়েকজন নারী যাঁরা ভিন্ন ধরনের, যাঁরা এই প্রবাসে এসে যে পথে হাঁটছেন সে পথে জানাশোনা মুখের আনাগোনা প্রায় নেই বললেই চলে। যাঁরা পায়ে পায়ে চলার পথ তৈরি করে নিচ্ছেন নিজেরাই। কনক, মীরা ও অনিতা এমনই তিন মহিলা।



কনকের কথা

কনক দত্ত খুলনার মেয়ে। সেখানে ওঁদের পরিবার 'ঘাটভোগের চাটুজ্জে' নামে খ্যাত ছিল। খুলনাতেই স্কুলে পড়েছেন কনক আর সেখানেই তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি। রাজনীতিতে যোগ দেবার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন দিদিমা। তিনি ছিলেন তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের এক উৎসাহী কর্মী। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় কনক রাত জেগে বাড়িতে বসে পোস্টার লিখতেন – 'British Quit India', 'ইংরেজ ভারত ছাড়'; আর পরদিন সকালে ছেলেরা এসে সেগুলো নিয়ে জায়গায় জায়গায় ঝুলিয়ে দিত। ছোট্ট কনক সেই বিরাট আন্দোলনে যোগ দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করত। এখনো সেই স্মৃতি তাঁকে গর্বে ভরিয়ে দেয়। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়তে চলে এলেন কলকাতায়। জড়িয়ে পড়লেন রাজনীতিতে, আরও গভীরভাবে। যোগ দিলেন ছাত্র কংগ্রেসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম এ পড়া আর রাজনৈতিক কাজকর্ম দুই-ই চলল পাশাপাশি। এ সময় কনক অ্যাসেম্বলির নির্বাচনেও দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তরুণকান্তি ঘোষের কাছে হেরে গেলেন সে দফায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট শেষ হল, তবে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হল না। কংগ্রেস ছেড়ে প্রফুল্ল ঘোষের দলে যোগ দিলেন। পরে অবশ্য জনতা পার্টির সদস্যা হয়েছিলেন।

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে ছিলেন কনক দত্ত। বাইরের কাজে নামতে বাধা এসেছে অনেক। সেসব বাধা ডিঙোতে কম কষ্ট হয়নি। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এক গভীর বিশ্বাস। সে বিশ্বাস হল এই যে, সমাজকে পালটাতে হলে নিজেকে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যের আরব্ধ কাজের ফলভোগ স্বার্থপরতারই নিদর্শন মাত্র। নিজেকে শ্রম দিতে হবে, অকুণ্ঠচিত্তে



নিজের সময় দিতে হবে। কনকের মতে আদর্শবাদীদের জন্যে অন্য কোনো পথ খোলা নেই।

১৯৫১ সালে মনোরঞ্জনকে বিয়ে করলেন কনক। বিয়ের পরেও কিন্তু রাজনীতির কাজে ভাটা পড়ল না। মনোরঞ্জন কনকেরই পথের পথিক। এরপর ১৯৫৮ সালে স্বামী চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কনক এলেন ১৯৫৯ সালে, ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে। সেখানে ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়ায় এডুকেশন নিয়ে আর একটা এম এ শেষ করলেন। সংসারের জন্যে সারাদিন চাকরি, তারপর রাতে পড়া – এমনি করে চলল কয়েক বছর। প্রথম এক বছর বোর্ড অফ এডুকেশনে সাউথ এশিয়ানদের জন্যে পরামর্শকারী সদস্য হিসেবে ছিলেন। একটি স্কুলেও কিছুদিন পড়ালেন। ১৯৬৩ সাল থেকে নিউ জার্সিতে এসে রাটগার্স প্রেপারেটরি স্কুলে পড়াচ্ছেন। কিন্তু কুড়ি বছরের বেশি শিক্ষকতা করলেও কনকের আসল কাজ পড়ানো নয়। কনক মার্কিন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়। সে দেশের ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে কনকের যোগ ঘনিষ্ঠ। উনি নিউ জার্সির ফেডারেশন অফ ডেমোক্রাটিক উমেনদের পলিটিকাল-অ্যাকশন কমিটির সভাপতি। এছাড়া ব্রীজওয়াটার টাউনশিপ ও সমারসেট কাউন্টির ডেমোক্রাটিক কমিটির সদস্যা। ১৯৮৪ সালের ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে নিউ জার্সি থেকে উনি সেই পার্টির মনোনীত মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী ওয়ালটার মনডেলের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। মনডেলের নিউ জার্সি প্রতিনিধিদলের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে উনিই মনোনীত হন। ১৯৮০ ও ১৯৮২ সালের ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কনভেনশনেও উনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮১ সালে নিউ জার্সির বিধানসভায় উনি ডেমোক্রাটিক প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রতিপক্ষের কাছে খুব অল্প ভোটের জন্যে হেরে যান। এছাড়া মার্কিন সেনেটের ও নিউ জার্সির রাজ্যপাল নির্বাচনে উনি ক্যাম্পেন সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৯-'৮৯ এই এগারো বছর উনি নিউ জার্সির রাজ্যপালের এথ্নিক অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্যা ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমনি আরও অনেক কৃতিত্বের অধিকারিণী কনক দত্ত। তাঁর কাজের জন্যে অনেক স্বীকৃতি ও পুরস্কারও পেয়েছেন বিভিন্ন সংস্থা থেকে। কনকের কাজকর্মের দিকে তাকালে এক নিরলস রাজনৈতিক কর্মীর ছবিই ভেসে ওঠে।

"যতদিন ভাবতাম দেশে ফিরে যাব ততদিন এদেশের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি।" তাই যেদিন ঠিক করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা হবেন সেদিন থেকেই কনক দত্ত রাজনীতির কাজে উৎসাহী হলেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ছাড়াও আছে সুচিন্তিত যুক্তি। মার্কিন দেশে ভারতীয়দের সংখ্যা কিছু কম নয়। দিন দিন এই সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সারা দেশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভারতীয়দের অবস্থান। কিন্তু ভারতীয়রা যদি শুধু টাকা রোজগারেই মন দেয় আর মার্কিন দেশের অন্যান্য সমস্যাগুলি থেকে দূরে সরে থাকে, তাহলে সে সমাজে অপাঙক্তেয় হয়ে দাঁড়াতে তাদের বেশি সময় লাগবে না। মার্কিন সমাজের সুখদুঃখের সঙ্গে ভারতীয়দের জড়িয়ে পড়তে হবে। এই ভেবে কনক ও মনোরঞ্জন দত্ত রাজনীতির কাজে আবার যোগ দিলেন। কনক বললেন, "১৯৭২ সাল থেকে আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। নিজের প্রতি বিশ্বাস গড়ে তুলতে আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছি। নিজেদের এলাকার সামান্য কাজ থেকে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনের জন্যে আমি খেটেছি। তার বদলে কিন্তু কিছুই চাইনি।" এই পরিশ্রমের পুরস্কারই যে এতদিনে আসতে আরম্ভ করেছে, নানা নির্বাচনে কনকের সাফল্য দেখে তা বোঝা যায়। শুধু কনক দত্তের প্রতি নয়, সারা ভারতীয় সমাজের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে উনি সাহায্য করছেন।

কনক দত্ত বিদেশিনী, তিনি শ্যামলা এবং তিনি মহিলা। তিনটি বিশেষত্বই পাশ্চাত্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে অন্তরায়। প্রথম প্রথম রাজনৈতিক মিটিঙে কনক প্রতিকূল মনোভাব টের পেয়েছেন বইকি! কিন্তু তাতে দমে যাবার পাত্রী উনি নন। বললেন, "কোন সমাজে এই মনোভাব নেই? আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলে একজন সাদা মহিলা এলে তাকে কেউ সাদর অভ্যর্থনা জানাবে কি?" ধীরে ধীরে জনসাধারণকে উনি বোঝাতে পেরেছেন, বাহ্যিকভাবে অন্যরকম হলেও তাঁর ওপর নির্ভর করা চলে। ভেতরের কনক দত্ত খাঁটি মানুষ। এখন তাঁকে চেনে প্রায় সবাই। নির্বাচনে নতুন মুখ তিনি আর নন। এখনো বিরোধী মনোভাব দেখেন না তা নয়, তবে তা সামান্যই। ১৯৮১ সালে নির্বাচনী সভায় গিয়ে কনক বলতেন, "আমার রঙ বাদামী, আমি এশিয়ার অধিবাসী, আমি তোমাদের মত করে ইংরেজী উচ্চারণ করতে পারি না, আমি শাড়ি পরি, আমি মহিলা; – আমার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি পাবে। কিন্তু বাইরের এই পার্থক্যটুকু দেখে আমাকে বিচার কোরো না। আমার ক্ষমতা দেখে ভোট দাও। সেই আসল আমিটাকে ভোট দাও।" মনে হয় সেই আসল কনক দত্তকে নিউ জার্সির মানুষ চিনতে পেরেছে। কনকের এলাকায় বেশিরভাগ লোকই রক্ষণশীল সাদা আমেরিকান। মানসিক উদারতার জন্যে তারা বিখ্যাত নয়। এই এলাকায় ভোট জিততে হবে জেনেও কনক দত্ত শাড়ি ছাড়া অন্য কোনো পোশাক পরেন না। তাঁর লম্বা চুলে খোঁপা বাঁধা।

কনক স্বীকার করেন, পথ সহজ নয়। বিদেশী সমাজে সমস্ত বাধাবিপত্তি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগিয়ে যেতে গেলে রক্তক্ষরণ হতে বাধ্য। কিন্তু যে কোনো দেশের প্রথম অভিবাসীদের ভাগ্যে লড়াই অবশ্যম্ভাবী। উত্তর পুরুষের জন্যে পথ পরিষ্কার তাদেরই করতে হয়।

নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে কনকের মতামত স্পষ্ট। তাঁর মতে মানুষের ওপর জোর করে কতগুলো প্রাগৈতিহাসিক ভূমিকা চাপিয়ে দিলে ক্ষতি বই লাভ হয় না। নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা নির্ভর করা উচিত তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচির ওপর। নারী বলে সে নিকৃষ্ট রাজনীতিবিদ হবে, এই বিশ্বাসের ভিতে কোনো যুক্তি আছে কি? কিন্তু সমাজের এমন অবস্থা যে, বারম্বার নারীকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। কনকের মতে বাইরের জগতে কর্মরতা মহিলাদের দুটি ভার বইতে হয় – সংসারের আর বাইরের কাজের। মার্কিন দেশের নারী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ আছে। তাঁর মতে সে দেশের নারী আন্দোলন এখন সাফল্যের মুখ দেখছে। ষাট এবং সত্তর দশকের কঠিন সংগ্রামের পর এখন নারী সামাজিক মর্যাদা পাচ্ছে। সেজন্য আজ নারীকে আর তত লড়াকু হতে হচ্ছে না। তাই মহিলারা আজ রান্নাও করছেন, রাজনীতিও করছেন। দুই-ই আজ সম্মানজনক।

কিন্তু এখনও মার্কিন দেশের পুরুষশাসিত সমাজ অনেক সময় কনকের রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারে না। এক সভায় কনককে একজন জিজ্ঞেস করে বসল, "আপনি যে এইরকম বাইরে বাইরে কাজ করে বেড়াচ্ছেন, আপনার স্বামীর কি অবস্থা? তাঁকে বাড়িতে কে যত্ন করছে? কে সঙ্গ দিচ্ছে?" কনক উত্তর দিলেন সুন্দর ভাবে, বললেন, "আমি কিন্তু কোনদিনও শুনিনি কেউ কোনো পুরুষ রাজনৈতিক কর্মীকে এই প্রশ্নটি করেছে। পুরুষেরা মিটিঙে এলে বাড়িতে তার স্ত্রীর যত্ন কে করে? তাকে কে সঙ্গ দেয়? তবু বলি, আমি মিটিঙে আসার আগে

আমার স্বামীকে রেঁধে খাইয়ে এসেছি। সব সময়েই তাই করি।" তারপর হেসে আমাকে বললেন, "আর ওর রান্নার দৌড় যা – ওই ভাত আর ডিমসেদ্ধ অবধি।" কনক দত্তের আপত্তি মহিলাদের সংসারবৃত্তির ওপর নয়, বাইরের সমাজের জবরদস্তির ওপর। কনকের এক মেয়ে, কাবেরী, নিজে কৃতী ফিল্ম-মেকার। তাকে উনি স্বাধীনচেতা, আত্মনির্ভরশীল হতে উৎসাহ দিয়েছেন। নারী বলে ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখেননি।

নিউ জার্সির বড় বড় গাছের ছায়ায় ঘেরা একটি সুন্দর বাড়িতে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী থাকেন। বসার ঘরে যামিনী রায়ের আঁকা ছবি, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া আর মোরাদাবাদী পেতলের ফুলদানিতে দুটি ফুল। ছিমছাম ঘরে সযত্ন হাতের স্পর্শ। কনক ১৯৮৫ সালে আবার রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়াবেন। শেষ লক্ষ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিধানসভা – কংগ্রেস। দেশে ফিরে যাবার স্বপ্ন উনি দেখেন না, কিন্তু দেশের মায়া এখনও মনকে বেঁধে রেখেছে। কনক বললেন, "এখানকার রাজনৈতিক জগতে প্রভাব বিস্তার করে আমরা ভারতীয়েরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতকে কাছাকাছি আনতে পারি, ভারতের বাণিজ্যের ভিত শক্ত করে তুলতে পারি, বিদেশে থেকে তবেই দেশের জন্যে একটু কিছু করে উঠতে পারব।" কনকের মতে ভারতীয়েরা ধীরে ধীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী হয়ে উঠছে। কনক দত্ত তারই প্রতিভূ।

মীরার কথা

'সো ফার ফ্রম ইন্ডিয়া' (হিন্দুস্তান সে ইত্‌নি দূর) – যেন আমেরিকায় ভারতীয় অভিবাসী সমাজের চাপা দীর্ঘশ্বাস। ছাব্বিশ বছরের মীরা নায়ার এই অভিবাসীদের দুকূল হারানোর ব্যথা ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর ছবিতে। 'সো ফার ফ্রম ইন্ডিয়া' মীরার তৈরি দ্বিতীয় ছবি। ৫২ মিনিটের এই রঙিন ডক্যুমেন্টারিটি ভারতীয় ও বিদেশী চলচ্চিত্র সমালোচক ও সমঝদারদের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেয়েছে। নিউইয়র্ক ফিল্ম ফেস্টিভাল, আমেরিকান ফিল্ম ফেস্টিভাল, মার্গারেট মীড ফিল্ম ফেস্টিভাল, ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভাল ইত্যাদি আরও এক ডজন ফিল্ম ফেস্টিভালে ছবিটি স্থান পেয়েছে, আর সেই সঙ্গে লাভ করেছে বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ভারত ও আমেরিকার টেলিভিশনে ছবিটি ইতিমধ্যে দেখানো হয়েছে। ছবিটির সংবেদনশীলতা ও গল্প বলার সহজ ভঙ্গি দর্শকদের বারে বারে মুগ্ধ করেছে।

মীরা পাঞ্জাবের মেয়ে হলেও বড় হয়েছেন ওড়িশার ভুবনেশ্বরে। সিমলা ও দিল্লিতে পড়াশুনা করেছেন কিছুদিন। নাটকের প্রতি মীরার গভীর ভালবাসা। ভারতে দু'বছরের মত ব্যারী জনের সঙ্গে থিয়েটার অ্যাকশন গ্রুপে কাজ করেছেন। তারপর আঠারো বছর বয়সে অভিনয় শিখতে চলে এলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু অভিনয়ের বদলে শিখলেন চলচ্চিত্র তৈরির শিল্প। ছাত্রাবস্থায় তাঁর তৈরি কুড়ি মিনিটের ডক্যুমেন্টারী 'জাম্মা মসজিদ স্ট্রিট জার্নাল' আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়। পরে এটি ভারত ও আমেরিকার টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে। কলেজের পাট চুকিয়ে মীরা চলে এলেন নিউইয়র্কে, স্বাধীন চলচ্চিত্রকারদের তীর্থক্ষেত্রে। এখানে তাঁর প্রথম কাজ সহকারী এডিটার হিসেবে, 'দাদীস্ ফ্যামিলি' নামে একটি ছবিতে। এই ছবিতে সাহায্য করার সময়ই তাঁর মনে দানা বাঁধল ভারতীয় অভিবাসীদের জীবন নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা। এই কল্পনাই মূর্ত হল 'সো ফার ফ্রম ইন্ডিয়া' ছবিতে।

মীরা নায়ারের ডক্যুমেন্টারি ছবিতে কোনো স্ক্রিপ্ট থাকে না। এ ধরনের ছবিকে বাস্তবের সিনেমা বলা হয়। একটি বিষয় স্থির করে পরিচালক সেই বিষয়োপযোগী পাত্র খোঁজেন। তারপর সেই ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন ক্যামেরার ছবিতে ধরে রাখার চেষ্টা চলে। পরে এডিটিং টেবিলে এসে গল্পটি গড়ে তোলা হয়। এমনি করেই মীরা নিউইয়র্কের অশোক শেঠ,বিয়ের মাত্র কুড়িদিন পরে আমেদাবাদে ফেলে আসা তার স্ত্রী হংসা, আর তাদের ছেলের গল্প ছবিতে তুলে ধরেছেন। অভিবাসী অশোক মনের দিকে তার স্ত্রী-পুত্র, পরিবারের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছে অনেক, কিন্তু আমেরিকার দ্রুতলয়ের জীবনের সঙ্গে পুরোপুরি একাত্ম হয়ে যেতে পারেনি। অশোকের সমস্যা সব দেশের সব কালের অভিবাসীদের চেনা। এখানেই মীরার বাহাদুরি।

মীরার পরবর্তী ডক্যুমেন্টারি ছবি তোলা হচ্ছে ভারতে – এক ক্যাবারে নর্তকীকে কেন্দ্র করে। এই নর্তকী, তার এক পুরুষ খদ্দের এবং সেই খদ্দেরের স্ত্রীকে নিয়েই ছবির গল্প। এই ত্রিভুজের প্রতিটি শীর্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণ করছেন মীরা। সমাজের নিম্নস্তরের নাচওয়ালী, সতীসাধ্বী স্ত্রী, আর এই দুই নারীর মধ্যে সেতু-রচনাকারী সেই পুরুষের মূল্যবোধ কি, আমাদের সমাজে ভালমন্দের সংজ্ঞা কি, এই মূল্যবোধের দৃঢ়তা ও তার মাঝে লুকোনো সামাজিক অন্যায়কে তিনি লোকের সামনে তুলে ধরতে চান। উপদেশ-বাণী দিয়ে পৃথিবীর গতি পালটে দিতে মীরা উৎসাহী নন। তিনি বলেন, "আশা করি আমার ছবি দেখে লোকের মনে প্রশ্ন জাগবে। চিরাচরিত সামাজিক মূল্যগুলিকে তারা একটু নতুন চোখে দেখবে।" এই ছবির বিষয়বস্তু শুধু ভারতীয় জনসমাজের জন্যে নয়, আন্তর্জাতিক আসরেও এর গভীর মূল্য আছে।

ছবিটির বিষয়বস্তু নারী আন্দোলনের একটি প্রধান বক্তব্য হলেও পাশ্চাত্য নারী আন্দোলনের প্রতি মীরা নায়ার সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে তৃতীয় বিশ্বের পরিস্থিতি পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এত ভিন্ন যে, ভারত ও আমেরিকার নারী আন্দোলন এক রূপ নিতে পারে না। দুয়ের মূল মতবাদ এক হলেও পথ পৃথক হতে বাধ্য। নারীমুক্তি আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য নারী ও পুরুষের সমানাধিকার, মীরার কাছে অতি আবশ্যক বাস্তবমাত্র। নিজের জীবনে মীরা সমানাধিকার ভোগ করেছেন চিরকাল। বিদেশে মুষ্টিমেয় ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে অন্যতমা হলেও ভারতীয় বা মহিলা বলে মীরা বিশেষ কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন হননি কোনদিন। তিনি বলেন, "আমি একজন মহিলা এবং আমি ভারতীয়, দুটি বৈশিষ্ট্যই আমাকে বরং অনেক সুবিধা করে দিয়েছে।" মীরার পরের ছবির বিষয় নারীর সামাজিক পদমর্যাদা নিয়ে হলেও, তারপর উনি কি বিষয় নিয়ে ছবি করবেন তার কোনো ঠিক নেই। নানা বিষয়, নানা দেশ, নানা পরিস্থিতি নিয়ে উনি ভবিষ্যতে পরীক্ষা চালাতে চান।

নাটক মীরার প্রথম দয়িত হলে কি হবে, এখন উনি বিশ্বাস করেন চলচ্চিত্রই হল ওঁর শিল্পসত্তা প্রকাশের সঠিক মাধ্যম। চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে অগুনতি মানুষের মনকে স্পর্শ করা সম্ভব হয়, ওঁর মত শিল্পীর পক্ষে সেটাই খুব তৃপ্তিকর। কিন্তু ছবি তোলার বাধাও অনেক। তার মধ্যে প্রধান হল টাকা। ছবির জন্যে টাকা যোগাড় করা এত কঠিন যে, মীরার মতে সিনেমাকে যদি মনেপ্রাণে ভাল না বাসা যায় তাহলে এ লাইনে কাজ না করাই উচিত। 'সো ফার ফ্রম ইন্ডিয়া'র অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষক জুটেছিল বহু কষ্টে, অনেক সাধ্য-সাধনায়। প্রথমে এগিয়ে আসে নিউইয়র্ক কাউন্সিল ফর দা হিউম্যানিটিস, তারপর আসে ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর দ্য হিউম্যানিটিস, জেরোম ফাউন্ডেশন আর এয়ার ইন্ডিয়া। ছবিটির

সাফল্যের সঙ্গে অর্থাগমের পথ সহজ হয়েছে নিশ্চয়ই, তবু প্রতিটি ছবি করতেই এই বাধা প্রথমে ডিঙোতে হয়। ক্যাবারে নর্তকী নিয়ে ছবিটির জন্যে অর্থসাহায্য দিচ্ছে জার্মান ও ফ্রেঞ্চ টেলিভিশন কোম্পানি। ক্যানেডিয়ান টেলিভিশনের জন্যে তৃতীয় বিশ্বের পরিবার পরিকল্পনার ওপরও একটি ছবি তুলছেন মীরা। তারপর তাঁর ইচ্ছা আছে একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের আত্মজীবনীমূলক ছবি করার।

মীরার বাবা ভারতে আই এ এস অফিসার। ভাইবোনেরা সকলেই ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত। শিল্পকলার ব্যাপারে বাড়ির দিক থেকে কখনো কোনো উৎসাহ আসেনি। ছবি তোলার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সত্যজিৎ রায়, পিটার ব্রুকের কাজ দেখে। "এছাড়া আমার চারদিকের পৃথিবী, বহমান জীবনই আমার অনুপ্রেরণা।" ইদানীংকালে অনুপ্রেরণা এসেছে স্বামী মিচ্ এপ্স্টিনের কাছ থেকে। মিচ্ একজন স্টিল ফটোগ্রাফার, তবে মীরার ছবির জন্যে ক্যামেরার কাজ উনিই করেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজে ব্যস্ত। মীরা বললেন, "আমাদের দুজনেরই আলাদা দুটো কর্মজীবন আছে। আর আছে একটি জীবন যা আমরা দুজনে একসঙ্গে উপভোগ করি।" সন্তানের চিন্তা এই মুহূর্তে করছেন না মীরা। কিন্তু ভবিষ্যতে তারা আসবে বইকি! সন্তানের কাছ থেকে কাজে আরও বেশি অনুপ্রেরণা আসবে, এ বিশ্বাস উনি রাখেন।

মীরা নায়ার তাঁর ছবি তোলার জন্যে ভারত ও আমেরিকা, দুই পৃথিবীতেই বসতি রাখতে চান। ভারতের সঙ্গে তাঁর আত্মার যোগ, ভারতের নানা সমস্যা তাঁর নিজের সমস্যা। কিন্তু ভারতীয় দর্শক ডকুমেন্টারি ছবি এখনও গ্রহণ করতে অভ্যস্ত নয়। তাই সেখানে তাঁর ছবির জন্যে টাকা তোলা প্রায় দুঃসাধ্য হবে, এই ভয় তাঁর আছে। তবে নতুন পরিচালকদের কাজে উনি আশার আলো দেখতে পান। তাঁর মতে স্বল্প বাজেটের ছবিগুলি যে আজকাল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তা আজকের দর্শকের নতুন রুচিরই ইঙ্গিত। এই পথে এগোতে থাকলে হয়তো শিগ্গিরই মীরার মত চলচ্চিত্রকারদের কদর বাড়বে ভারতে। নবাগত চিত্রতারকা ও কলাকুশলীদের সচেষ্ট হয়ে পুরনো, বস্তাপচা নাচেগানে ভরা ফর্মুলা ছবির বাজার ভেঙে দিতে আহ্বান জানালেন উনি। আর স্বাগত জানালেন অপর্ণা সেনের মত মহিলা পরিচালকদের। চিত্রজগতে মহিলা পরিচালকদের প্রবেশ ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে বলে মীরার বিশ্বাস।

অনিতার কথা

অনিতা রাজের জীবনের প্রথম একুশ বছর কেটেছে মাদ্রাজে, অনিতা রত্নম্ নামে। সেখানেই বি এ পাশ করেছেন ইংরেজী নিয়ে। অনিতা কনভেন্টের ইংরেজী পরিবেশে পড়াশোনা করলে কি হবে, দক্ষিণী পরিবারের প্রথা অনুসারে তিন বছর বয়স থেকেই তাঁর নৃত্যশিক্ষার শুরু। কর্ণাটকী সঙ্গীত ও ভরতনাট্যম দুটিতেই তিনি যথেষ্ট পারদর্শিনী। পরে রুক্মিণী দেবীর শিক্ষালয়, কলাক্ষেত্রে তিনি নাচ আর নাট্যশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তারপর নাটক নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্যে চলে এলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, লুইসিয়ানার নিউ অর্লিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে এম এ করলেন নাট্য-পরিচালনায়। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল গ্রীক ও ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এটি পরে বই হিসেবে ভারতে প্রকাশিত হয়।

পড়াশুনার পর চাকরি। সেই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের ধনী পরিবারের কন্যা নিউইয়র্কে চলে এলেন। ১৯৭৯ সালে বম্বে ব্রডকাস্টিং কোম্পানিতে উনি অ্যাডভার্টাইজিং ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেলেন। এইসময় বম্বে ব্রডকাস্টিং কোম্পানি টেলিভিশনের জন্যে একটি প্রোগ্রাম শুরু করার কথা ভাবছিল। অনিতার ওপর ভার পড়ল ক্যামেরার সামনে গিয়ে সেই প্রোগ্রাম পরিচালনা করার। ১৯৮১ সালে ফেব্রুয়ারির ৭ তারিখে 'সিনেমা সিনেমা'র জন্ম হল।

সেই সময়ে 'সিনেমা সিনেমা'র একমাত্র কর্মচারী ছিল অনিতা। এখন এই জনপ্রিয় শো'টির কর্মীসংখ্যা বারো। এক ঘণ্টার এই শো'টি প্রতি শনিবার সকালে নিউইয়র্ক-নিউ



মীরা নায়ারের ছবি 'সো ফার ফ্রম ইণ্ডিয়া'র একটি দৃশ্যে অশোক শেঠ, হংসা ও তাদের ছেলে   ফটো ঃ মিচ্ এপ্স্টিন (মীরা নায়ারের সৌজন্যে)

জার্সি এলাকায় ন'টার সময় প্রচারিত হয়। একটু একটু করে 'সিনেমা সিনেমা' দর্শকের মন কেড়েছে। ইংরেজীতে কথিত এই শো'টি শুধু ভারতীয় নয়, মধ্যপ্রাচ্যের দর্শকের কাছেও আজ প্রিয় হয়ে উঠেছে। সাধারণত কোনো একটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে গীতিমূলক শো'টি গড়ে ওঠে। কোনদিন হয় হিন্দি ছবির রোমান্টিক গান, কোনদিন পঞ্চাশ দশকের গান, কোনদিন বা হিন্দি ছবিতে বাঙালীর অবদান। মাঝে মাঝে থাকে প্রতিষ্ঠিত বা নবাগত চিত্রতারকাদের ইন্টারভিউ। একটু কথা দিয়ে হিন্দি চলচ্চিত্র থেকে নেওয়া গানের দৃশ্যগুলির পরিচয় দেন অনিতা, আর এর ফাঁকে ফাঁকে ভারতীয় চিত্রজগতের ছোটখাট খবরাখবর পরিবেশন করেন। মোটমাট হালকা মেজাজের অনুষ্ঠান। তবে গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে যে একদম আলোচনা হয় না তা নয়। কিছুদিন আগে অমৃতসরের ঘটনাবলীর ওপর এক ঘন্টার একটি বিতর্কমূলক প্রোগ্রাম করেছেন অনিতা।

"কোম্পানি শুরু হবার সময় এটা এত ছোট ছিল যে আমি নিজেই সবকিছু করতাম" অনিতা বললেন। "টাইপিং, স্ক্রিপ্ট লেখা, বিজ্ঞাপন যোগাড় করা, এডিটিং, ক্যামেরার সামনে শো চালানো, এমনকি মাঝে মাঝে ক্যামেরায় ছবি তোলা সবই।" এই হাতে-কলমে কাজের অভিজ্ঞতার ফলে অনিতা টেলিভিশন প্রোডাকশনের সবরকম কাজই আজ জানেন। মাঝে মাঝে দুজন অতিথি-পরিচালক থাকার ফলে অনিতা এখন ক্যামেরার সামনের কাজ থেকে কিছুটা অব্যাহতি পেয়েছেন, কিন্তু প্রতিটি শো'র স্ক্রিপ্ট লেখা ও এডিটিং-এর দায়িত্ব এখনও ওঁরই। বম্বে ব্রডকাস্টিং কোম্পানির জনক কোম্পানি, বম্বে হোল্ডিং কোম্পানির মালিক পি গিরি রাজকে বিয়ে করেছেন অনিতা। বম্বে ব্রডকাস্টিং তাই সম্পূর্ণভাবে এখন ওঁরই। ফলে দায়-দায়িত্বও প্রচুর।

নাট্য-পরিচালনায় শিক্ষিতা অনিতা টেলিভিশনকে কোনদিনই বিশেষ পছন্দ করতেন না। দর্শকের উষ্ণ স্পর্শ থেকে দূরে সরে যন্ত্রের সামনে কথা বলার মধ্যে উনি বিশেষ সৌন্দর্য খুঁজে পাননি। কিন্তু এখন টেলিভিশনের ক্ষমতা ওঁকে মুগ্ধ করেছে আর নিজের শো'তে কাজ করে যে তৃপ্তি উনি পেয়েছেন তা অন্য কোনো কাজে পাবেন কিনা সন্দেহ। 'সিনেমা সিনেমা'র উদ্দেশ্য সমাজ সংস্কার বা রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নয়। অনিতা এর মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সচেষ্ট নন। তাঁর উদ্দেশ্য শনিবার সকালের একটি ঘন্টা হাসি আর আনন্দে ভরিয়ে দেওয়া। এই আনন্দ দেওয়ার কাজেই 'সিনেমা সিনেমা' কুশলী হয়ে উঠতে চায়। আর তারই জন্যে অনিতা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। এতদিন পর্যন্ত কেবলমাত্র বম্বে চিত্রজগৎ নিয়েই 'সিনেমা সিনেমা' ব্যস্ত থেকেছে। এবার ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ছবি, চিত্রতারকা ও কলাকুশলীদের বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এই কাজের জন্যেই বম্বে ব্রডকাস্টিং-এর কর্মীরা এ বছরের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ভারতে যাচ্ছেন। সেখানে মাদ্রাজ ও বম্বের চিত্রজগতে ঘুরে ঘুরে তাঁরা 'সিনেমা সিনেমা'র জন্যে মালমশলা যোগাড় করবেন। একটি গান রেকর্ডিং করার বা একটি দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের পেছনে কতটা পরিশ্রম লুকিয়ে আছে, সেটাকে তাঁরা দর্শকের কাছে তুলে ধরতে চান।

ভারতীয় নারী হয়ে বিদেশে অনিতা বিশেষ কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হননি। অনিতার মতে, তার প্রধান কারণ আমেরিকান টিভি জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অল্প। 'সিনেমা সিনেমা'র দর্শকমন্ডলীর আশি শতাংশই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, তাছাড়া কোম্পানির মালিকও তিনি নিজেই। তাই মহিলা বলে বিশেষ কোনো সমস্যা তাঁর হয়নি। তবে অনিতা মৃদু হেসে স্বীকার করলেন, ব্যবসায়ী বুদ্ধি তাঁর কম। শিল্প সৃষ্টিতেই তাঁর সুখ, ব্যবসায়ে নয়। তবু সবদিকে নজর রাখতে সেদিকটাও তাঁকে শিখতে হয়েছে বইকি!

পাশ্চাত্য নারী আন্দোলন সম্পর্কে অনিতার মতামত দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর মতে ভারতীয় নারীরা পাশ্চাত্য নারীসমাজের থেকে এগিয়ে আছে। "আমাদের দেশে ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন অনেকদিন আগেই।" নারী আন্দোলনের জন্যে প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় মিছিল করতে উনি রাজী নন। অনিতার মতে ভারতীয় নারীরা সহ্যের আগুনে পুড়ে শক্ত হয়ে উঠেছে খাঁটি ইস্পাতের মত। তারা সবকিছু সহ্য করে তারপর ধীরে ধীরে সমাজের পরিবর্তন ঘটায়। নারীত্ব বলতে উনি বোঝেন নারীর সহজাত নম্রতা, সৌন্দর্য, পেলবতা। তবে পাশ্চাত্য নারীসমাজে সমস্যা যে বেশি তা উনি স্বীকার করেন।

বাইরের জগতের কাজে ব্যস্ত থাকলেও নিজের সংসারের কাজকর্ম অনিতাকেই সামলাতে হয়। সারাদিনের পর রান্না করতে ইচ্ছে না করলেও উপায় কি! রান্না করতেই হয়। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁরা শুধু দুজন। ভবিষ্যৎ জীবনে সন্তান এলে কিভাবে চলবে তা অনিতা জানেন না। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, বাইরের কাজ ছেড়ে শুধু ঘরসংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকা ওঁর পক্ষে আর সম্ভব নয়। তিরিশ বছরের অনিতা নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে গেলে সন্তানের কথা ভাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তার সঙ্গে এক কর্মব্যস্ত জীবনের ছবিও দেখেন। "এদেশে থাকার ফলে একটা জিনিস শিখেছি। বয়সটা আজ আর কিছুই নয়। দেশে থাকলে এতদিনে সকলে নিশ্চয়ই বলত আমার বাচ্চাকাচ্চা হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে বয়স পেরিয়ে যাবার চাপটা নেই। এখানে সব কৃতী মহিলারাই চল্লিশোর্দ্ধে।" এছাড়া ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় আছে আরেকটি প্রোগ্রাম যা শুধু ভারতীয় খবরাখবরে আবদ্ধ থাকবে না। সেটিতে সমস্ত উপমহাদেশের সংবাদ পরিবেশন করা হবে। এছাড়া ভিডিও ক্যাসেটে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও নাচ শেখানোর ভাবনাও চলছে। আর পরিকল্পনায় রয়েছে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটি ছবি। অনিতার মতে বিশাল বাজেটের হিন্দি ছবির দিন ফুরিয়ে এসেছে। আজকের দর্শক আর নাচ-গান, ঘুষোঘুষি ও গাছের আড়ালে প্রেমের গল্পে সন্তুষ্ট নয়। অর্ধসত্য, বাজার, আক্রোশের মত ছবি আজকাল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এর মানে দর্শক অন্য কিছু চায়। তবে অনিতা বিশ্বাস করেন ছবির বিষয়বস্তু দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। অনেক পরীক্ষামূলক ছবির অর্থ পরিচালক আর সমালোচক ছাড়া আর কেউ বোঝে না। তেমন ছবি তৈরির দিকে তাঁর ঝোঁক নেই। নিজের শিল্পসত্তার পরিতৃপ্তি ঘটিয়েও দর্শকের মনের দরবারে ছবি পৌঁছে দেওয়া যায়। এ দুটি পরস্পর বিরোধী কখনই নয়। ভবিষ্যতের ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনিতা আশাবাদী। তবে তাঁর মতে পুরনো ফিল্মী সঙ্গীতের এখনও জুড়ি মেলা ভার।

দেশের ভাবনা অনিতার মন জুড়ে থাকে সবসময়। "যত দিন যাচ্ছে আমি যেন তত বেশি মনেপ্রাণে ভারতীয় হয়ে পড়ছি।" তাই অনিতার দৈনন্দিন পরিচ্ছদ শাড়ি আর চুড়িদার-কুর্তা। "পশ্চিমী পোশাক পরতে আজকাল আর একদম ভাল লাগে না।" মার্কিন দেশের একাকিত্ব অনিতাকে পীড়া দেয়। সে দেশের দৈনন্দিন জীবনের চাপে তাঁর মন প্রায়ই হাঁপিয়ে ওঠে। অনিতা দেশে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখেন প্রায়ই সেখানে টেলিভিশনের কাজে জড়িয়ে পড়তে তিনি উৎসুক। তবে যতদিন তা সম্ভব হয় ততদিন দুই দেশের মধ্যে এই সেতু রচনার কাজই তিনি করে যেতে চান

গ্রামের শিক্ষিতা মেয়েদের ভাবনা

কবিতা দাশ

একটা সময় ছিল যখন ‘গ্রাম’ বললেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত দারিদ্র্যে, অশিক্ষায়, কুসংস্কারে ভরা একটি ক্ষুদ্র লোকালয়ের ছবি। গ্রাম বলতে আজ আর সে-অবস্থা বোঝায় না। শিক্ষায়-দীক্ষায় নতুন চিন্তা-ভাবনায় গ্রামের মেয়েরাও শহরের মেয়েদের কাছাকাছি চলে এসেছে আজ। শিক্ষার্জনের পথেও দুস্তর বাধা অতিক্রম করে সফল হচ্ছে তারা। কলেজ-পড়ুয়া কয়েকজন গ্রামের মেয়ের ভাবনায় তাদেরই সমস্যার কথা জানানো হয়েছে এই রচনাটিতে।



এখানে বিজলী বাতি জ্বলে না/ফটো : শ্যামল মাইতি

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ সারা বিশ্বে সাড়ম্বরে পালিত হয়ে গেছে ১৯৭৫ সালে। নারীবর্ষে শপথ নেওয়া হয়েছিল নারীদের প্রগতি ও সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করা হবে এবং বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিও এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তার থেকে প্রায় এক দশক অতিক্রম করে এসে আমরা দেখছি নারীরা বিভিন্নভাবে অবহেলিত, নানা সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে গ্রামের মেয়েরা

আজ থেকে এক শতাব্দী আগে যখন স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে মূলত বিদ্যাসাগর মহাশয় আন্দোলন করছেন প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে, তখন অনেকেই সমালোচনা করেছেন মদনমোহন তর্কালংকার তাঁর ‘স্ত্রী শিক্ষা’ প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলেন "শিক্ষা, কার্যের উপযোগিনী যে যে শক্তিমত্তার আবশ্যক, স্ত্রী জাতিরে সে সমুদয়ই আছে, কোন অংশের ন্যূনতা নাই বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কোন কোন বুদ্ধিবৃত্তির আধিক্যই ... তবুও, আর একটি শতাব্দী পেরিয়ে, নতুন শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে দেখছি স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বহুল সমস্যা বর্তমান সরকারি প্রচেষ্টা ততখানি সজীব নয় এবং সেই সঙ্গে প্রচলিত সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন না করার ফলেই আজও সেই সমস্যা সর্বদাই খোঁচা দিচ্ছে গ্রামের মেয়েদের সমস্যা এক্ষেত্রে আরও ভয়ংকর। তাদের নানান সমস্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রাম্য অনুশাসন, প্রচলিত সংস্কার ও রীতিনীতির ফলে অনেক সময়ই গ্রামের মেয়েদের মাঝপথে শিক্ষার রাশ টানতে হয় তাদের নানান সমস্যার দিকগুলি তুলে ধরার জন্য হাজির হয়েছিলাম কলেজ পড়ুয়া কয়েকজন গ্রামের মেয়ের কাছে। মূল দিকগুলি নির্দেশ করবার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছিলাম তাদের সামনে কলেজে পড়াকালীন তাদের চাহিদা কী কী, শহরের তুলনায় গ্রামে কী কী তফাত অনুভব করে সাজে পোশাকে, চিন্তা-ভাবনায়, যাতায়াত ও টিফিন খাবার সমস্যা, গ্রামে কূটচালির পাত্রীর কতখানি, গ্রাম্য আধুনিকতা প্রভাবিত করে কি না এবং অবসর সময় কিভাবে কাটে, সংস্কৃতিমনা মেয়েদের কী ধরনের বাধা পেতে হয়, ছেলেদের সংগে স্বাভাবিক মেলামেশা কতখানি সম্ভব – খারাপ না ভাল – বাধা আসে কিনা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের ভাবনা কী? তারা এই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হয়ে কেউ খোলাখুলি সব জানিয়েছে, আবার কেউ সংকুচিত হয়েছে। তাদের এই সমস্যাগুলি পাঠকদের সামনে মেলে ধরলাম।

প্রথমেই হাজির হয়েছিলাম হলদিয়ার একমাত্র কলেজ বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী লিপিকা গুহর কাছে। কলেজে পড়াকালীন ওর চাহিদা মূলত পড়াশুনা-সংক্রান্ত। ওর কলেজে ভাল লাইব্রেরি নেই। প্রয়োজনীয় বই না পাওয়ার ফলে পড়াশুনার ক্ষতি হয়। এছাড়া ও ভাল বন্ধুর অভাব অনুভব করে। শহর ও গ্রামের ক্ষেত্রে পোশাক, আদব-কায়দা, আচরণের মধ্যে লিপিকা বেশ কিছু তফাত অনুভব করে। শহরের উগ্র আধুনিক পোশাক ও রীতিনীতি ওর পছন্দ নয়। যেসব মেয়েরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত, তারা অনেক ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে প্রচলিত সংস্কার ভেঙে। প্রায় দেড় মাইল রাস্তা হেঁটে বাস ধরে ওকে কলেজে আসতে হয়। বর্ষাকালে রাস্তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ও অসহায়ভাবে জানাল, ‘বছরের অর্ধেক সময় আমাদের যে কি অবস্থা বুঝতেই পারছেন। স্বল্প পরিসর কমন রুমে বসার মেলে না, তাই বাইরে গিয়ে টিফিন সারতে হয়।’ গ্রামের কূটচালির মধ্যেই ওকে কলেজে আসতে হয়। অনেক সমালোচনা এবং নোংরামোর সম্মুখীন হতে হয়। গ্রাম্য আধুনিকতা ওকে আদৌ প্রভাবিত করে না। লিপিকা বলল, ‘গ্রাম্য আধুনিকতা বিকৃত রুচির পরিচায়ক। আমি মনে করি শিক্ষা আমাদের সবদিক থেকে পরিশীলিত করবে। রুচি ও মানসিকতা যদি মার্জিত না হয়, তাহলে শিক্ষার তাৎপর্য থাকল কোথায়? অবসর কাটাবার কোনো সমস্যা নেই এই মুহূর্তে। অবসর সময় বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হয়।’ বই পড়ে, গান শুনে, সেলাই করে, সিনেমা দেখে ওর অবসর সময় কাটে। কবিতার বই ওর প্রিয় – বিশেষ করে আধুনিক কবিতা। ‘রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ যখন যে বই পাই তাই পড়ি।’ উত্তমকুমারের কোনো ছবি এলে ও দেখার চেষ্টা করে।

লিপিকা সংস্কৃতিচর্চা করতে ভালবাসে। কলেজের অনুষ্ঠানে এবং বাইরের অনেক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ও ‘মেঘমল্লার’ নামে একটি সংস্কৃতিক সংস্থার সক্রিয় সদস্যা। বাড়ি থেকে এই ব্যাপারে কোনো বাধা আসে না। ছেলেদের সংগে স্বাভাবিক মেলামেশায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সীমারেখা টানতে হয়। হতাশার সুরে লিপিকা জানাল, ‘এই সমাজ ব্যবস্থায় এর থেকে ভাল কিছু আশা করা বোধহয় পাপ।’ ও মনে করে, ছেলেদের সংগে মেলামেশা কেন খারাপ হতে যাবে! ‘আমি মনে করি ছেলেদের সংগে বন্ধুর মত মিশলে তাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহারই পাওয়া যায়। বাড়ি থেকে এই ব্যাপারে কোনো বাধা পেতে হয় না। কিন্তু গ্রামের অনেক মানুষ একে নিয়ে সমালোচনায় মুখর থাকেন।’ শেষ প্রশ্নের উত্তরে ও বলল, ‘শিক্ষা শেষ করে মা-বাবার মত শিক্ষকতা করতে চাই। ভবিষ্যতে একটি সুন্দর একান্নবর্তী সংসারে নিজেকে সুগৃহিণী হিসেবে দেখতে চাই।’

বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়ের

লাইব্রেরির স্বল্প পরিসর রিডিং রুমে বসে কথা হচ্ছিল সাম্মানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রথম বর্ষের ছাত্রী সুজলা পালের সঙ্গে। চঞ্চল এই মেয়েটি সবসময় ছটফট করতে করতে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল। ও জানাল, 'জীবনধারণের ক্ষেত্রে সব মানুষেরই কিছু মৌল চাহিদা রয়েছে। আমারও সেই জাতীয় কিছু চাহিদা রয়েছে।' সাজ-পোশাকের ব্যাপারে ওর ধারণা, 'পোশাকের মধ্যে নগ্নতা থাকবে কেন? ভারতীয় সমাজে নারীদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সেক্ষেত্রে তাদের পোশাকের মধ্যে একটা শালীনতা থাকবে।' শহরের থেকে গ্রামে সব ব্যাপারেই ও তফাত অনুভব করে। যাতায়াতের সমস্যা ওর কাছে খুবই কষ্টদায়ক। যাতায়াতের ব্যাপারে ওর বক্তব্য, 'স্বাধীন ভারতেও যাতায়াতের সুষ্ঠু সমাধান হল না। প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে এসে বাস ধরতে হয়। বাসে সময় লাগে দশ মিনিট। বর্ষাকালের গ্রামের রাস্তা সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরা বুঝতে পারবেন কি কষ্ট করে আমাদের কলেজে আসতে হয়।' গ্রাম্য কূটচালির শিকার ও। কলেজে যাতায়াতের পথে এই নিয়ে অনেক মন্তব্য, সমালোচনা ওকে নীরবে হজম করতে হয়। সুজলা বলল, 'গ্রাম্য আধুনিকতার ভাল দিকটি আমাকে প্রভাবিত করে; কিন্তু খারাপ দিকটি আদৌ টানে না।' অবসর সময় বই পড়ে, গান শুনে এবং বাড়ির কাজের মধ্যে কাটে। রহস্য উপন্যাস আর গানের মধ্যে আধুনিক গানই ওর প্রিয়। সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে বাড়ির এবং বাইরের কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। ও বলল, 'ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশা সম্ভবপর নয়।' এই মেলামেশার গন্ডি শুধুমাত্র কলেজেই – তার বাইরে ওর নিজেরই ভাল লাগে না ছেলেদের সঙ্গে মিশতে। বাধা অবশ্যই আসে বাড়ি এবং বাইরের থেকে। ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর সুগৃহিণী হওয়ার কথা ভাবছে সুজলা।

মহিষাদল রাজ কলেজের বিজ্ঞান নিয়ে পড়া একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রাজশ্রী জানার সঙ্গে তার সমস্যা নিয়ে কথা বলছিলাম। বইয়ের অপ্রতুলতার জন্য তার পড়াশুনায় অসুবিধা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ভাল বন্ধুর অভাবও তাকে পীড়িত করে। শহরের তুলনায় গ্রামে পোশাকের ব্যাপারে এবং চিন্তা-ভাবনায় তফাত অনুভব করে ও। তিন কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে বাস ধরতে হয়। যাতায়াতে যে সময় নষ্ট হয় তাতে পড়াশুনার ক্ষতি তো হয়ই, শরীরের উপর চাপও পড়ে। কলেজে ক্যান্টিন আছে – তাই টিফিন খাবার ব্যাপারে রাজশ্রীর কোনো সমস্যা নেই। গ্রাম্য সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় না ঠিকই, তবে পেছনে অনেকেই মন্তব্য করে। 'গ্রাম্য আধুনিকতার মধ্যে সাজ-পোশাক আমাকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আমি প্রভাবিত হই' – রাজশ্রী বলল। অবসর সময় কাটাবার কোনো সমস্যা নেই। বই পড়ে, বাড়ির কাজ করে, গল্প করে সময় কাটে। শরৎচন্দ্র এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই ভাল লাগে ওর। সংস্কৃতি-চর্চার ব্যাপারে বাড়ি থেকে কোনো বাধা আসে না। 'পারিপার্শ্বিক দিক থেকে আমি সমালোচনার মুখোমুখি হইনি এখনো পর্যন্ত। ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশা খুব বেশি সম্ভব নয় গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থার জন্য।' ওর মতে ছেলেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা অবশ্যই ভাল। বাড়ি থেকে বাধার সামনে দাঁড়াতে না হলেও বাইরে এই ব্যাপারে সমালোচনা শুনতে হয়। রাজশ্রী বলল, 'ভবিষ্যতে ডাক্তারি পড়তে চাই। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর বিয়ে করব।'

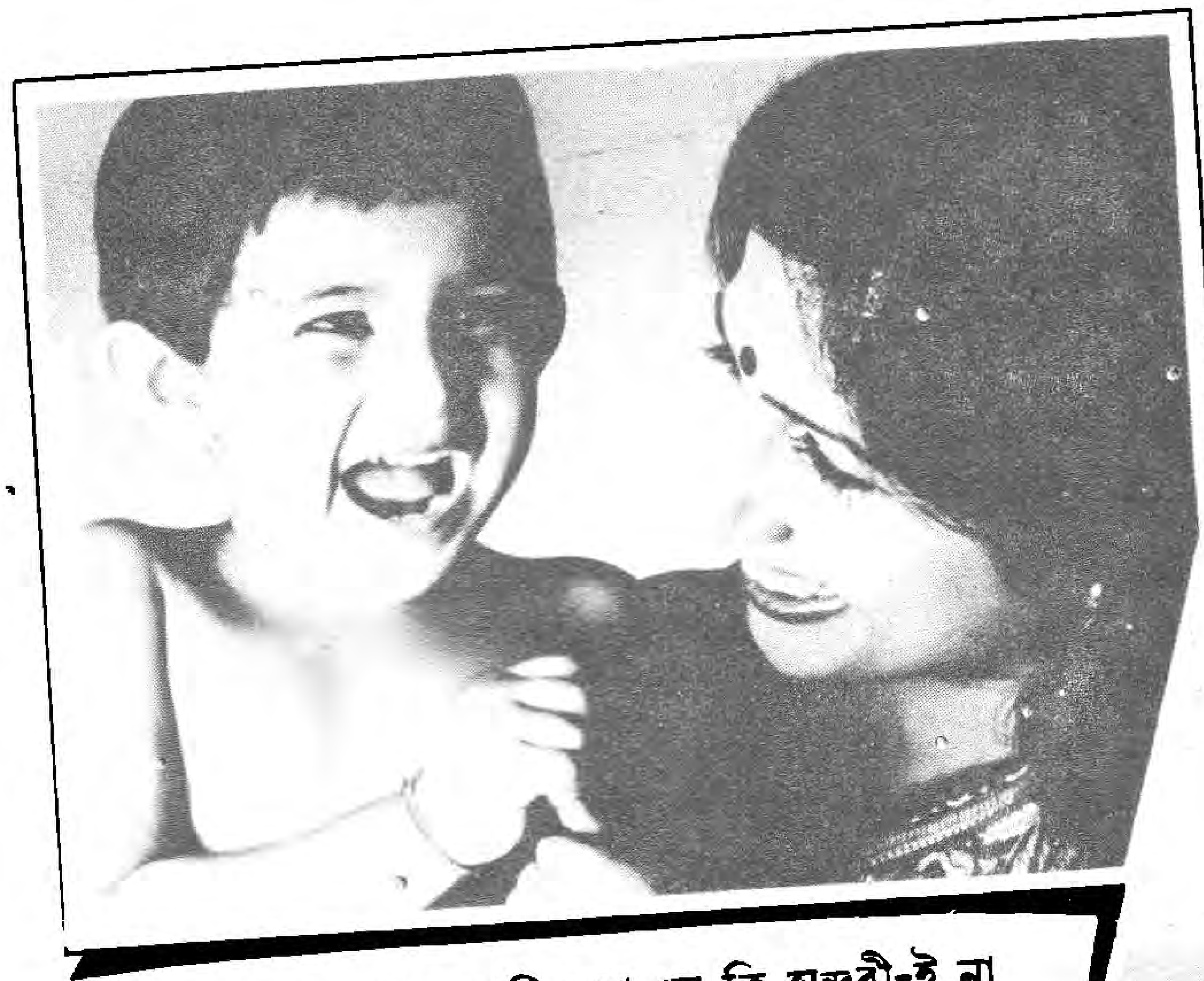
এক ঘরোয়া পরিবেশে কথা হচ্ছিল মহিষাদল গার্লস কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শিউলি চক্রবর্তীর সঙ্গে। ভাল বইয়ের চাহিদা অনুভব করে ও। সঙ্গে সঙ্গে ভাল লাইব্রেরির অভাব তো আছেই, যার জন্য সাহায্যকারী পুস্তকের অভাবে পড়াশুনার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শিউলি বলল, 'শহরের থেকে গ্রামের তফাত খুব ভালভাবেই অনুভূত হয়। সাজ-পোশাকের ব্যাপারেই তফাতটা বেশি চোখে পড়ে। পোশাকের মধ্যে শালীনতা থাকবে – যাতে করে মেয়েদের অন্তত লজ্জাবোধটুকু সবার চোখে পড়ে। এছাড়া চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েরা অনেক পিছিয়ে আছে শহরের মেয়েদের থেকে।' সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে, বাসে আধঘন্টা সময় নিয়ে তবে ওকে কলেজে পৌঁছতে হয়। 'কলেজে যাতায়াতের জন্য যে পরিশ্রম ও সময় নষ্ট হয় রাত্রে বাড়িতে ফিরে পড়ায় আর উৎসাহ থাকে না' – ও বলল।



যাতায়াত এক সমস্যা / ফটো : লেখিকা সংগৃহীত

গ্রাম্য সমালোচনার প্রসঙ্গে ওর বক্তব্য, 'গ্রামের মানুষের মধ্যে এই সংকীর্ণ মনোভাব এখনো রয়ে গেছে, বড় মেয়ে কেন পড়বে! এই নিয়ে নানা মন্তব্য, নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তবু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই সব সমালোচনাকে উপেক্ষা করতেই হবে।' গ্রাম্য আধুনিকতা ওকে আদৌ প্রভাবিত করে না। অবসর সময় কাটাবার কোনো সমস্যা ওর নেই। বই পড়ে এবং বাড়ির কাজ করে ওর সময় কাটে। শরৎচন্দ্রের বই ওকে বেশি আকৃষ্ট করে। সংস্কৃতিমনা মেয়ে শিউলি সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সমাজে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে বাধা আসে। বাড়ির প্রধানদের কাছ থেকে বাধা এলেও মা-বাবার দিক থেকে উৎসাহই পায় ও। ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশা কতখানি সম্ভব – এই প্রশ্নের জবাবে বলল, 'আমি গার্লস কলেজে পড়ি। সুতরাং পড়াকালীন কোনো ছেলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আসে না। তবে আমি সব ছেলের সঙ্গে মেশারও পক্ষপাতী নই। আমি মনে করি ছেলেদের সঙ্গে মেশা ভাল, কিন্তু সবার সঙ্গে নয়। বাড়ির দিক থেকে কোনো বাধা আসে না এই ব্যাপারে। মা-বাবা এতখানি রক্ষণশীল নন। আমার মনে হয় ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিক মেলামেশার ব্যাপারে নিজের মতামতই যথেষ্ট।' ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওর ভাবনা – পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হবে। সুযোগ পেলে বাবার মতো শিক্ষকতা করবে। বিয়ের কথা বলতে ও সলজ্জ হেসে বলল, 'একটি সুন্দর সুখের সংসার গড়তে চাই আমি।'

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের সাম্মানিক অর্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী রূপশ্রী বিজলীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ও জানাল যে, গ্রামে তো নেই-ই, এমনকি কলেজেও কোনো ভালো লাইব্রেরি নেই। কাজেই পড়াশুনার ব্যাপারে যে সমস্ত বইয়ের চাহিদা রয়েছে, তার থেকে ও বঞ্চিত। যদিও ডিগ্রী কোর্সের দু-একটা বই মেলে, অনার্সের কোনো বই-ই পায় না। তাছাড়া অধ্যাপকরা সেইভাবে মনোযোগ দিয়ে পড়ান না। কাজেই পড়াশুনার ব্যাপারে প্রচন্ড অসুবিধা অনুভব করে। শহরের তুলনায় গ্রামে নানাদিক থেকে তফাত অনুভব করে রূপশ্রী। চিন্তা-ভাবনায় ও সাজে-পোশাকে। ও চায় বাঙালি মেয়েদের পোশাকের মধ্যে একটা শালীনতাবোধ থাকবে, তারা বিকৃতরুচির পরিচয় দেবে কেন! কলেজে যাতায়াতের পথে খুবই অসুবিধে হয়। খুব অসহায় কন্ঠে জানাল রূপশ্রী, 'এক মাইল হেঁটে বাসের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বাসে দেড় ঘন্টা সময় লাগে আমার।' 'বাড়ি থেকে টিফিন নিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়। কলেজে ক্যান্টিনের অব্যবস্থার জন্য বাইরেই টিফিন সারি।' কলেজে যাতায়াতের পেছনে ওকে কোনো গ্রাম্য কূটকচালির সম্মুখীন হতে হয় না, তবে পেছনে অনেকেই অনেক সময় মন্তব্য করে।



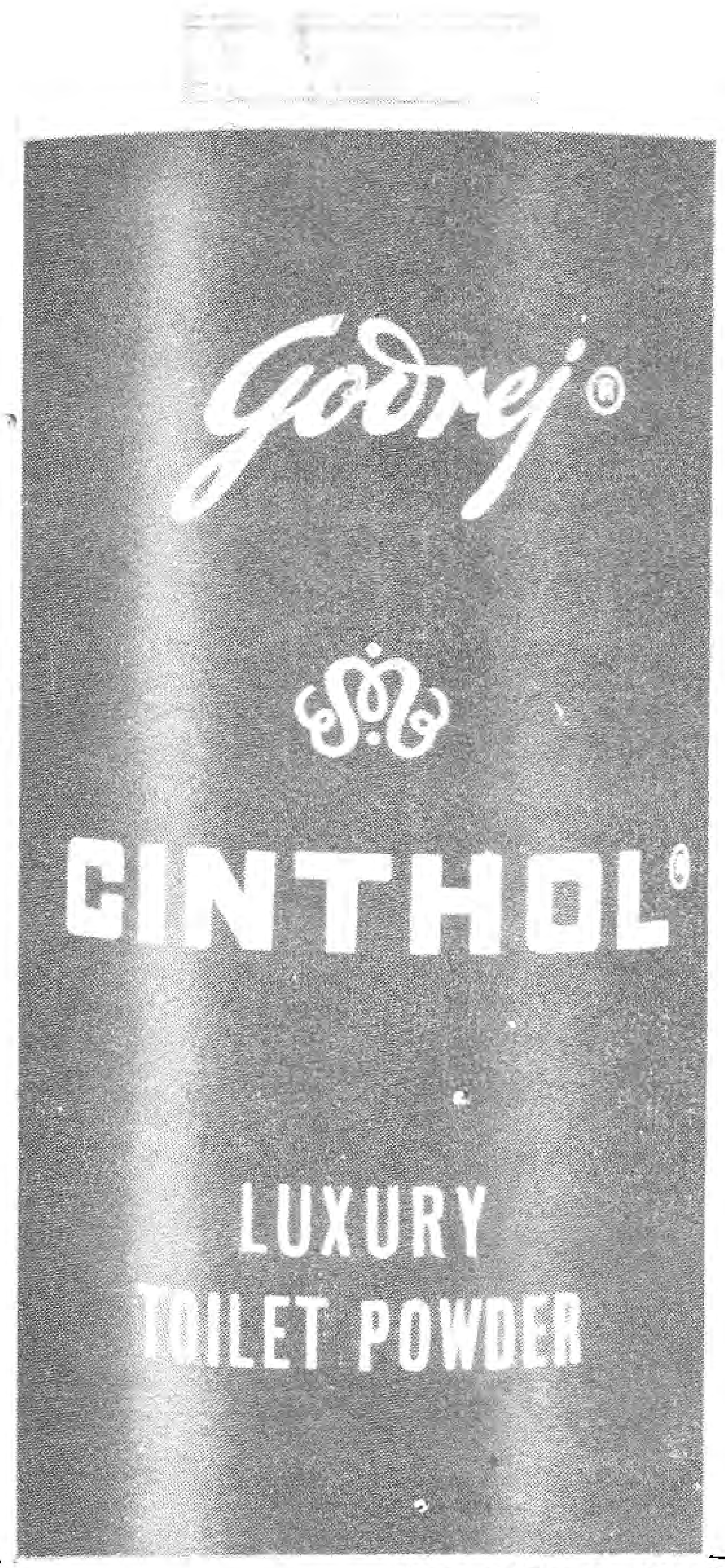
"ঐ আমার মা, কোলে আমি। মা-কে কি সুন্দরী-ই না
দেখাচ্ছে। আর, সিন্থল-এর সেই মিষ্টি গন্ধ··· আ-হা···!"



"ঐ আমার বাবা আমাকে নিয়ে খেলছেন, এক পিকনিকে।
আর, সিন্থল-এর সেই সুবাসে — দুজনে কেমন হাসে!"



"এতে আমি ও আমার স্বামী। আমাদের মধুর মিলন
ঘটালো কে? টেনিস্ না সিন্থল-এর সৌরভ?"



সকলকেই আকর্ষণ করে অতুলনীয়
সুগন্ধে ভরা সিন্থল। তাই, আজই আনুন
সিন্থল··· সারা পরিবার হোক্ খুশীর
জোয়ারে চঞ্চল। সিন্থল-এর সৌরভ আপনার
আনন্দের মুহূর্তগুলিকে স্মৃতিতে সদা তাজা রাখে।

Godrej
উৎপাদন

৪০০ আর ১০০ গ্রামে পাওয়া যায়।

CHAITRA-G-201 BEN

গ্রাম্য আধুনিকতা ওকে প্রভাবিত করে না। অবসর সময় কাটানোর কোনো সমস্যা নেই ওর। বাড়িতে বই পড়ে, গান করে, গল্প করে সময় কাটে। সংস্কৃতিচর্চার ব্যাপারে বাড়িতে কোনো বাধা পেতে হয় না, তবে বাইরের থেকে কোনো কোনো সময় বাধা আসে। ছেলেদের সংগে স্বাভাবিক মেলামেশাকে ও খারাপ চোখে দেখে না। তবে সেভাবে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায় না। কারণ পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে চলতে হয়। ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ওর ভাবনা, 'আগে পড়াশুনা শেষ হোক, তারপর সব কিছু।' তবে শেষ পর্যন্ত যদি অনার্স থাকে তাহলে ওর ম্যানেজমেন্ট পড়ার ইচ্ছে আছে। তারপর একটি ভদ্র চাকরি পেলে সুখী সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখে ও।

বিকেলের শান্ত কলেজের লেডিজ কমন রুমে বসে কথা বলছিলাম ঊর্মি সামন্তর সংগে। ঊর্মি হলদিয়ার বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে বাণিজ্য নিয়ে পড়ে। কলেজে পড়াকালীন ওর মূল চাহিদা বইয়ের। এই মুহূর্তে অন্য কোনো চাহিদা মনে করতে পারছে না বলে জানাল। 'বাঙালি মেয়েদের সৌন্দর্য হচ্ছে শাড়ি। শহরে দেখি শাড়ি ছেড়ে অন্য বিসদৃশ পোশাক পরতে। আমার মনে হয় তা শোভন নয়। এছাড়া অন্যান্য ব্যাপারেও তফাত চোখে পড়ে। এক মাইল রাস্তা হেঁটে তবে বাস ধরতে হয়। বাসে প্রায় কুড়ি মিনিট সময় লাগে। এক ঘন্টা অন্তর বাস। একটু দেরি হলেই সময়মতো ক্লাসে পৌঁছতে পারি না। বাড়ি থেকে টিফিন আনা সম্ভব নয় বলেই দোকান থেকে টিফিন কিনে খেতে হয়। গ্রাম্য সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় না একেবারেই।' সাজপোশাকের মধ্যে যে আধুনিকতা এসেছে গ্রামের মধ্যে, তা ঊর্মিকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতার ছোঁয়া ওকে প্রভাবিত করে। 'অবসর সময় কাটানোর কোনো সমস্যা নেই' ও বলল। বাড়ির সামনে দিয়ে হুগলী নদী বয়ে চলেছে, বিকেলের শান্ত পরিবেশে ওর খুব বেড়াতে ভাল লাগে। এছাড়া বই পড়ে, গান ও আবৃত্তি করে সময় কেটে যায়। সত্যজিৎ রায়ের রহস্য উপন্যাস ওর প্রিয়। সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের মেয়ে ঊর্মি বলল, 'কোনো বাধা পেতে হয় না। বাড়ির স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ পাই প্রত্যেকটি ব্যাপারে।' ছেলেদের সংগে অবাধ মেলামেশায় ওর আপত্তি নেই ঠিকই, তবে মার্জিত ও ভদ্র ছেলেদের সংগে মেশার পক্ষপাতী ও। ঊর্মি জানাল, 'মেলামেশার ব্যাপারে বাড়ি থেকে কোনো আপত্তি আসবে না, যদি আমি ভালো ছেলেদের সংগে মিশি।' ভবিষ্যতে ও একজন আদর্শ শিক্ষিকা হতে চায়। বিয়ের ব্যাপারে কিছু ভাবছে কিনা জিজ্ঞেস করতে বলল, 'এখনো কিছু ভাবিনি।'

হিন্দু কলেজের 'সর্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছিলেন, "কেবলমাত্র বিরোধী মনোভাবের জন্যেই নয়, কতকগুলি বিকৃত সামাজিক প্রথার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হয়েছে বলেই অসহায় মানুষ ইচ্ছা থাকলেও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসতে পারছে না। তাই কেবলমাত্র বিরোধীদের কুযুক্তির যথার্থ প্রত্যুত্তর দিলেই চলবে না, মানবতা-বিরোধী যুক্তিহীন এই সামাজিক প্রথাগুলিকে সর্ব্বাগ্রে দূর করতে হবে।" তাই আজ যেসব সমস্যা আমাদের চোখে ধরা পড়ছে, তাকে দূর করবার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। নইলে নারীপ্রগতি এবং সমানাধিকারের শপথ শুধুমাত্র কাগজ-কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার বাস্তব রূপ আমরা কখনই দেখতে পাব না।

উলের টি শার্ট

সবসময় আমরা আকর্ষণীয় বৈচিত্র্যময় সাজে সাজাতে ব্যস্ত আমাদের ছেলেমেয়েকে, ভাই-বোনকে, নিজেদের তো বটেই। গরম জামা-কাপড়েও এর ব্যতিক্রম নেই। এরকমই একটি শার্টের প্রস্তুত-পদ্ধতি দেওয়া হল – যা অনন্যসাধারণ না হলেও অ-সাধারণ।

এতে যা লাগবে : ৫টি গাঢ় বেগুনী ও ২টি সাদা ২৫ গ্রামের ৪ প্লাই ক্যাশমিলন উলের গোলা। ১ জোড়া করে যথাক্রমে ১১, ১০, ৯, ৮, ৭নং কাঁটা। একটি ৪ ইঞ্চি চেন। চেনটি উলের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। উল যদি ভাল হয় তবে আর একটু কমই লাগবে। উল সব সময়ই একটু বেশি নেওয়া ভাল। কারণ কম পড়লে রঙ মেলানো খুব কঠিন হয়। বাঁচলে বরং আজকাল প্রায় সব দোকানেই ফেরত নেয়। কলকাতার শীতে ক্যাশমিলনই যথেষ্ট হয় বলে এখানে ক্যাশমিলন উলই ব্যবহার করা হয়েছে।

মাপ : ঝুল-২৫ ইঞ্চি, বুক-৩০ ইঞ্চি। এটি ১২- ১৩ বছরের ছেলের মাপের।

প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে ১০ নং কাঁটায় ১০০ ঘর তুলে সামনের খন্ড আরম্ভ করুন। ১ টি সোজা, ১ টি উল্টোর বর্ডার করুন আড়াই ইঞ্চি। তারপর ৮ নং কাঁটায় ১ কাঁটা সোজা ১ কাঁটা উল্টো বুনে নিন।

পরের লাইন বেগুনী উল দিয়ে প্রথমে ৩৪ ঘর সোজা বুনুন। তারপর সাদা উল জুড়ে ৪ ঘর সাদা দিয়ে সোজা বুনে আবার ৪ ঘর বেগুনী দিয়ে বুনুন। তারপর সাদা সোজা, ২ বেগুনী সোজা, ২ সাদা সোজা, ২ বেগুনী সোজা, ২ সাদা সোজা, ২ বেগুনী সোজা, ২ সাদা সোজা বুনে ৪৪ ঘর বেগুনী দিয়ে বুনুন।

পরের লাইন সব উল্টো, কেবল সাদা ঘর সাদা দিয়ে, বেগুনীর জায়গায় বেগুনী দিয়ে বোনা হবে।

পরের লাইন : ৩৪ বেগুনী সোজা, ৪ সাদা সোজা, ৬ বেগুনী সোজা, ২ সাদা সোজা, ২ বেগুনী সোজা, ২ সাদা সোজা, ২ বেগুনী সোজা, ২ সাদা সোজা, ২ বেগুনী সোজা, ২ সাদা সোজা, এবারে ৪২ বেগুনী সোজা।

পরের লাইন : সব উল্টো। কেবল সাদার জায়গায় সাদা দিয়ে ও বেগুনীর জায়গায় বেগুনী উল দিয়ে বোনা হবে।

পরের লাইন : আবার প্রথম ডিজাইন শুরু করার সময় যেমন বোনা হয়েছিল সেরকম করে বুনে যান। এভাবে যখন ঝুল সাড়ে বারো ইঞ্চি হবে তখন বুকের বাঁদিকের ভাগের অংশ অর্থাৎ বোনার প্রথম থেকেই সাদা দিয়ে বুনে ৪ টি সাদার সঙ্গে মিলিয়ে আবার ডিজাইন বুনুন। ৪ কাঁটা সাদা দিয়ে বোনার পর একইভাবে



শুধু বেগুনী দিয়ে প্রথম থেকে বুনে গিয়ে ৪টি বেগুনী ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে আবার ৪ কাঁটা একই রকমভাবে বুনুন। এবারে প্রথম থেকেই ২ বেগুনী ২ সাদার ডিজাইন বুনে মাঝের ডিজাইনের সঙ্গে মিলিয়ে বুনুন। ১৬ কাঁটা বোনার পর আবার শুধু বেগুনী দিয়ে ৪ কাঁটা বুনুন, তারপর সাদা দিয়ে ৪ কাঁটা বুনে নিয়ে আবার আরম্ভের মত শুধু মাঝের ডিজাইন ও ধারের সাদা লাইন করে বুনে যান। যখন ঝুল সাড়ে ষোল ইঞ্চি হবে তখন বগল ফেলা আরম্ভ করুন। মনে রাখতে হবে বুকের ডানদিকের ভাগে কিছুই হচ্ছে না। যা কিছু সব বাঁদিকের ভাগে। বগলের জন্য প্রথমে ৬টি করে দুদিকে ঘর বন্ধ করুন। পরে জোড়া করে করে ৪ টি করে ঘর বন্ধ করুন। এরপর বগল থেকে ২ ইঞ্চি বোনা হয়ে গেলে কেবল কাঁটার ঘরকে সমান দুভাগে ভাগ করুন। দুভাগেই বুকের মাঝখানের দিকের সোজা বা উল্টো বোনার সময় প্রথম ঘরটি তুলে নিন না বুনে। এতে ধার সমান থাকবে। চেন বসানোর সময় দেখতে ভালো লাগবে। দুভাগ আলাদা আলাদা করে ভাগের পর থেকে ৪ ইঞ্চি বুনে গলার ঘর ফেলা আরম্ভ করুন ও ডিজাইন এখানেই শেষ করে শুধু বেগুনী দিয়ে বুনে যান। ভাগ করার ফলে এক-একদিকে ৪০ টি করে ঘর থাকবে। এই ৪০ টির মধ্যে ২২ টি করে কাঁধের জন্য রেখে বাকি ১৮ টির প্রথমে ১২ টি, পরে যথাক্রমে ৩ টি, ২ টি ও ১ টি করে গলার জন্য ঘর বন্ধ করুন। এই ঘর বন্ধ হবে বাঁদিকের ভাগের উল্টো কাঁটার শুরুতে, আর ডানদিকের ভাগের সোজা কাঁটার শুরুতে। এভাবে গলার গভীরতা আড়াই ইঞ্চি হয়ে গেলে কাঁধের ঘর বন্ধ করুন। এর জন্য ঘর বন্ধ করার পর খানিকটা এমনিও বুনে যেতে হবে। পিছনদিকের জন্য ১০ নং কাঁটায় প্রথমে ৯০ ঘর তুলে বর্ডার করে পরে ৮ নং কাঁটায় তুলে নিয়ে ঠিক সামনের দিকের মতই ডিজাইন বুনে যেতে হবে। কেবল ঘরের ভাগ হবে প্রথমে ২৯ টি ঘর বেগুনী বুনে ৪ ঘর সাদা, ৪ ঘর বেগুনী ইত্যাদি বুনতে হবে। শেষে ৩৭ টি ঘর বেগুনী উলে বোনা হবে। বাকি সবই সামনের খন্ডের মত। আর গলার জন্য কাঁধের ২২ টি করে ৪৪ টি ঘর বাদে ২৬ টি ঘর বন্ধ করা হবে। বগলে বন্ধ হবে ১০ টি করে ২০ টি। কাঁধ থেকে যখন ১ ইঞ্চি বাকি থাকবে তখন প্রথমে মাঝখানে একসঙ্গে ২০ টি ঘর বন্ধ করে পরে একবার ২ টি করে দুপাশে, একবার ১ টি করে দুপাশে ঘর বন্ধ করতে হবে।

হাতের জন্য প্রথমে ৫৬টি করে ঘর তুলে ১০ নং কাঁটায় ১ ইঞ্চি বর্ডার করে মাঝখানে কিছুটা ডিজাইন হবে। হাতের ঝুল আন্দাজ মত করে বগল ফেলা হবে। তবে বগল ফেলার আগে ৪ কাঁটা পরপর দুপাশে ১ টি করে ঘর বাড়িয়ে ৭০ টি করে নিতে হবে। এরপর বগলের জন্য প্রথমে ৩ টি করে দুপাশে, তারপর প্রত্যেক সোজা কাঁটার প্রথমে ও শেষে ১ টি করে জোড়া বুনে ঘর কমিয়ে যেতে হবে। মাপ পুরো হয়ে গেলে কাঁটায় যে কটা ঘর থাকবে বন্ধ করে দিতে হবে। সবশেষে কলারের জন্য আলাদা করে শুধু সাদা উল দিয়ে ১১ নং কাঁটায় ১০০ টি তুলুন। তারপর ১ ইঞ্চি ১ টি সোজা ১ টি উল্টো করে বুনুন। এরপর ১০ নং কাঁটায় আবার ১ ইঞ্চি বুনুন। তারপর ১ ইঞ্চি ৯ নং কাঁটায় বুনুন। তারপর ১ ইঞ্চি ৮ নং কাঁটায় বুনুন। সবশেষে ১ ইঞ্চি ৭ নং কাঁটায় বুনে ঘর বন্ধ করুন।

সব খন্ড মিলিয়ে সেলাই করুন। কলারটিকে দুভাঁজ করে ঠিক মাঝামাঝি ভাগকে পেছনদিকের গলার মাঝামাঝি অংশের সঙ্গে পিন দিয়ে আটকে নিন। আর দুটি পিন দিয়ে সামনের গলার দুদিকে কলারের এক-একধারের সঙ্গে আটকে নিয়ে সেলাই করুন। তাতে কলার ঠিক সমানভাবে বসবে। সবশেষে ইস্ত্রি করুন ও চেন বসিয়ে নিন। এই চেন বসানোর কাজটি একটু সতর্ক হয়ে করতে হবে। চেনের কাপড়ের অংশ যেন দেখা না যায়, আর বোনার ধার দুটিও সমানভাবে দুদিক মিলিয়ে বসানো হয়। এর জন্য প্রথমে টেঁকে নিয়ে পরে একই রঙের সুতো দিয়ে হেম করে বসানোই ভাল।

পুতুল খান্না

ফটো : সৌগত রায় বর্মন

সমাজের আঙিনায় মেয়েরা

ব্রততী চন্দ

একটা বুকস্টলের সামনে দাঁড়িয়ে সাজানো ম্যাগাজিনগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছিলাম। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল দুজন ছেলে। ওদের পরস্পরের মধ্যে কথা হচ্ছিল। টুকরো কিছু কথা আমার কানেও আসছিল। তবে সেগুলো আর-পাঁচটা শব্দের মত। হঠাৎ একজন বলল, 'দেখেছিস নতুন একটা মেয়ে কাগজ বেরিয়েছে।' অন্যজন, 'মেয়ে কাগজ?' এই 'মেয়ে কাগজ' কথাটায় কেমন যেন একটা অন্যরকম সুর ছিল, যার জন্য ভাল করে তাকাতেই হল ছেলেদুটির দিকে। দেখে মনে হল ইউনিভার্সিটি বা ওই জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া ছেলে। কেমন যেন একটা সহানুভূতি, খানিকটা তাচ্ছিল্যভাব ছিল ছেলেটির কণ্ঠস্বরে। সাময়িক একটু রাগ হলেও পরে ওদের কথোপকথন নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখলাম – এ তো আমাদের সমাজের মজ্জাগত ব্যাপার। আজ আশির দশকে ভাবছি, আমরা মেয়েরা বোধহয় অনেক কিছু জয় করেছি। আজকে মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় আর পিছিয়ে নেই। সর্বত্র পুরুষ, নারীর মর্যাদা ও সম্মানে কোনো প্রভেদ নেই। আমাদের মা, পিসিমারা সমাজের কাছ থেকে অনেক অবহেলা, লাঞ্ছনা পেয়েছেন। আজ আমরা লেখাপড়া শিখে, চাকরি-বাকরি করে সংসারের দায়িত্ব নিতে পারছি। পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরিতে সমান ভাগ বসাচ্ছি, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে পিছিয়ে দিয়ে, যা এতদিন পুরুষের একচেটিয়া ছিল, সে-কাজও করায়ত্ত করে নিচ্ছি, অতএব আমরা পুরুষের তুলনায় কোনো অংশে কম নই বা পিছিয়ে নেই। কিন্তু নানা ঘটনার পাকে পড়ে মনে হয় কথাটার সম্পূর্ণ সত্যতা আজও বোধহয় নেই।

'মেয়ে' কথাটার মধ্যে এখনও রয়েছে সেই আদি অকৃত্রিম কেমন যেন একটা অবহেলার ভাব। পুরুষ যে 'বাঁকা হলেও সোনার আংটি' – তা যেন আমরা ভুলতে পারি না। স্বাধীনচেতা মন নিয়ে যে মেয়ে অনেক কথা বলে সেই তাকেই দেখেছি খাবার প্লেট সাজিয়ে পাত্রপক্ষের কাছে মাথা নিচু করে একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। এতে যেন দোষ নেই। নেই কিছু প্রতিবাদ করার। সমাজের সেই প্রাচীন তথাকথিত নিয়মগুলো যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে আমাদের। শিক্ষাদীক্ষা, পথেঘাটে বেরোনো, পাঁচটা মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা খানিকটা চৌকস হয়েছি, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ঘুরেফিরে সেখানেই আমাদের আসতে হচ্ছে যেখানে আমাদের রাখা হয়েছে খানিকটা অবহেলা, করুণা আর অনেকটা সহানুভূতির বেড়াজালে বেঁধে। একটা কথা মানি, এ সবকিছুর সঙ্গে খানিকটা সম্মান, শ্রদ্ধা আমরা আদায় করে নিয়েছি পুরুষদের কাছ থেকে, কিন্তু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে নারীত্বের বন্ধন থেকে আমরা এখনও বেরিয়ে আসতে পারিনি।

রমারা আমাদের প্রতিবেশী, সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে। বাবা সরকারি অফিসের কেরানি। দুই ভাই, দুই বোন। রমাই বড়। রমা হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে। ওর খুব শখ ডাক্তারি পড়ে। ওর বাবার তা ইচ্ছে নয়, কারণ ও যে মেয়ে! কাজেই তেমন প্রয়োজনীয় নয়। পরে দুটো ভাই আছে, তাদের চিন্তা আগে করতে হবে। রমার ভাইরা পড়াশুনায় ভাল, কিন্তু রমা আরও ভাল। কেবলমাত্র মেয়ে হবার অপরাধেই রমার জীবনের স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। মা-বাবার আশা ছেলেরা বড় হয়ে তাঁদের দেখবে। এরকম অনেক রমার বাবাই এই চিন্তা করেন। তার কারণটা অবশ্যই আমাদের সমাজের তৈরি। হাজার হোক মেয়ে তো অপরের ধন। কি হবে তার প্রতিভার বিকাশে। মেয়ের তুলনায় ছেলেদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অভিভাবকদের সবসময়ই দেখতে পাই। আমাদের সংসারে এই নিয়মকে আমরাই জিইয়ে রাখি। আমরা যারা নারী নির্যাতনের জন্যে সমাজকে কটাক্ষ করি, পুরুষশাসিত সমাজের পরিবর্তনের জন্যে পাতার পর পাতা বড় বড় কথা বলি, সেই আমরাই বাড়িতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের প্রতি নজর দিই অনেক বেশি।

একটা সাধারণ ব্যাপার আমরা প্রায়ই দেখি ডাক্তারি পেশার ক্ষেত্রে। ডাক্তারিতে আজকাল সব ছাত্রছাত্রীকেই জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে তবে সুযোগ করে নিতে হয়। সেখানে কিন্তু মেয়ে বলে কম নম্বর পেয়ে ভর্তি হওয়া যায় না। তারপর যথাসময়ে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে একই সঙ্গে পাশ করে তাদের পেশায় নিযুক্ত হল। হয়তো ছেলেটির তুলনায় মেয়েটির জ্ঞান ডাক্তারি শাস্ত্রে খানিকটা বেশি, তবু দেখা যায় লেডি ডাক্তারের কাছে ভিড় কম। তেমন মরণাপন্ন অসুখে লেডি ডাক্তার ডাকি আমরা কজন? অপারেশনের ক্ষেত্রে তো একথা দারুণভাবে প্রযোজ্য। আমার বাড়ির রোগীকে লেডি ডাক্তার অপারেট করলে সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, এমন দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের ক'জনের আছে? লেডি গাইনির যদিবা খানিকটা কদর দেখাই, অন্যান্য জটিল রোগেও কোনো মেয়ে ডাক্তার যে কোনো পুরুষ ডাক্তারের তুলনায় অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে এমন বিশ্বাস আমাদের নেই। এমনকি সাধারণ সিজার করবার ক্ষেত্রেও একমাত্র পারিবারিক বাধা ছাড়া আমরা পুরুষ ডাক্তারকেই খুঁজি। এরই মধ্যে দু'একজন যে নিয়ম-বহির্ভূত নয় এমন বলা যায় না। তবে তার সংখ্যা শতকরা দশ ভাগও নয়। পুরুষের প্রতি এই অবিচল নির্ভরতা যেন আমাদের জন্মগত। বাইরের শত সহস্র যুক্তি তর্কের আলোও মুক্ত করতে পারেনি আমাদের এই চিন্তাধারাকে।

শিক্ষার জগতেও এই এক ব্যাপার। মেয়েদের স্কুলে কলেজে যেখানে শিক্ষিকা ছাড়া চলবে না সেখানকার কথা আলাদা। বাড়িতে আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটর কিন্তু আমরা প্রায় ক্ষেত্রে পুরুষই খুঁজি। বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। একটু উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়ের জন্য আমরা শিক্ষকই পছন্দ করি বেশি। যেন মনে হয় পুরুষের সব ব্যাপারেই খানিকটা জোর রয়ে গেছে। শারীরিক শক্তির মতন আর কি! মাস্টারমশাই বাড়িতে মেয়েকে পড়াতে আসছেন; ব্যস্, মা নিশ্চিন্ত। বিজ্ঞানের দরজার চাবিকাঠি তিনিই পারবেন মেয়েকে দিতে। মাস্টারনী? কেমন যেন একটা খুঁতখুঁতে ভাব মার মনে লেগেই আছে। মেয়েকে বিজ্ঞানের জটিল পথে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারবেন তো? এসব ব্যাপারে কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে আমরা মেয়েরাই ইন্ধন যোগাই। আমরাই পুরুষের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মানের তুলনায় সহানুভূতি, করুণা আশা করি বেশি।

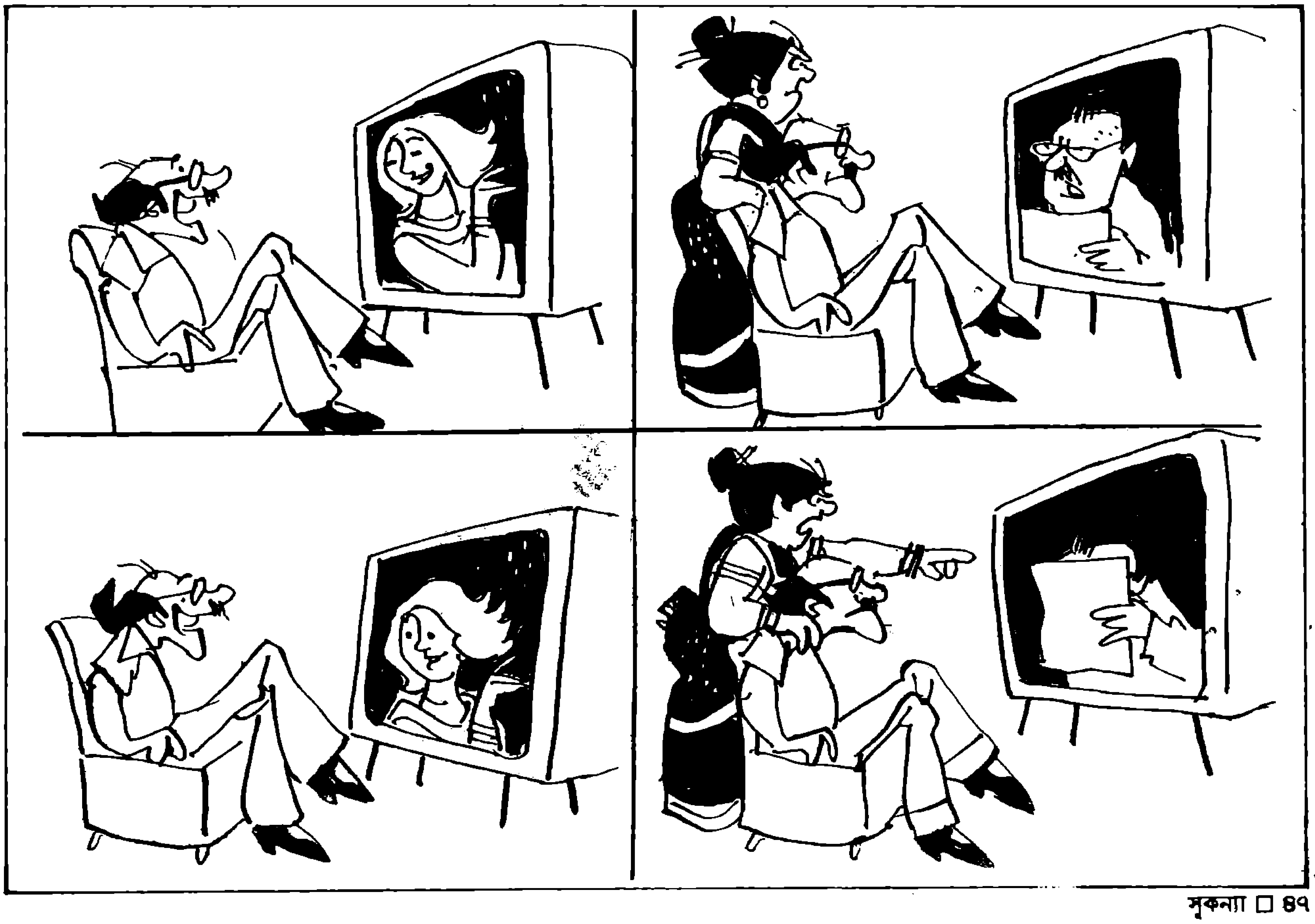
প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। আমাদের মধ্যে মহিলা বৈজ্ঞানিক, বিচারক, পাইলট, ডাক্তার আছেন ঠিকই – তবে তার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সমীক্ষা করলে দেখা যাবে শতকরা প্রায় ৮০ জন মেয়েকেই সাধারণ একটা পর্যায়ে ফেলা যায়। যেসব মহিলা এমন কিছু সম্মানজনক পদে আছেন যেখানে তাঁদের শ্রদ্ধা, সম্মান না করলেই নয়,

তাঁদের কথা আলাদা। যেমন, জেলাশাসক। সেখানে আমাকে তাঁর কথার প্রাধান্য দিতেই হবে। কিন্তু যদি এমন হত, একই জেলায় দুজন সমান ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক থাকবেন আর ঘটনাচক্রে যদি সেখানে একজন মহিলা, অপরজন পুরুষ হন তাহলে বোধহয় যে কোনো সমস্যার ব্যাপারে আমরা মহিলার কাছে যেতাম না।

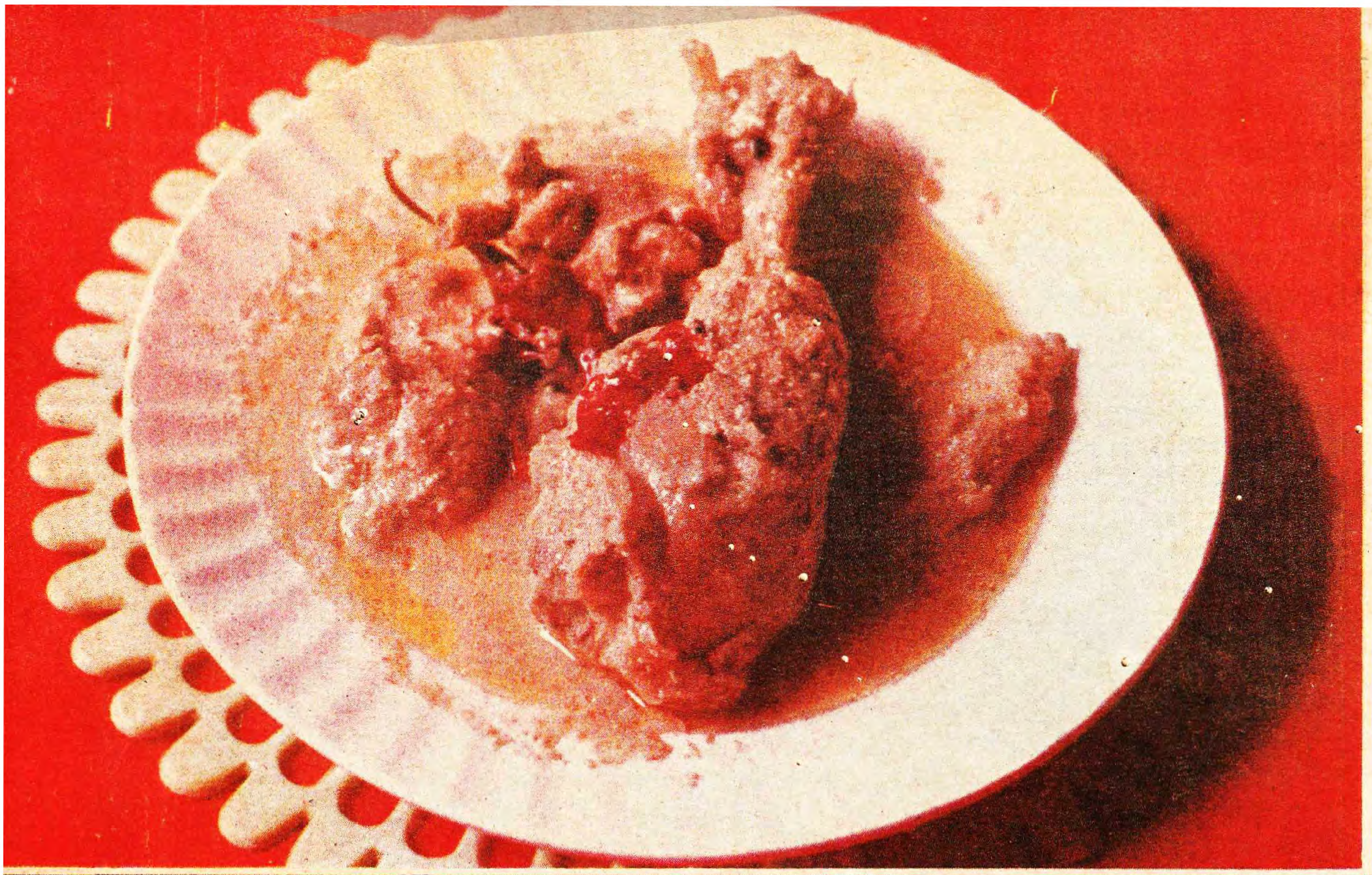
আজকাল পড়াশুনা, চাকরি-বাকরি, পথ চলা, সংসারের দায়িত্ব সব ক্ষেত্রেই তো মেয়েদের সমানভাবে পুরুষের সঙ্গে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। মেয়ে বলে কোনো জায়গাতেই রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। তবু যেন 'মেয়ে' শব্দটাকে পুরুষের সমপর্যায়ে আনা যায় না। আজ আমাদের আর ঘরবন্দী জীবন নেই। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে শুধুমাত্র মেয়ে বলে কোনো বাড়তি সুযোগ আমরা পাই না। সংসারে চাকরি করা মায়ের প্রাণ তো ওষ্ঠাগত। রোজ ট্রামে-বাসে ঝুলে ঝুলে অফিস যাওয়া, বাড়ি ফিরে রান্না, শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা, ছেলেমেয়ের তদারকি, পড়াশুনা করানো, সময় বিশেষে বাজার করা, অতিথি আপ্যায়ন, কি নেই? মেয়েদের 'ত্যাগের জীবন' কথাটার এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। আগে কেবল অন্তঃপুরে সংসার-চিন্তা নিয়ে থাকতে হত। সংসারে উপার্জন করার কথা চিন্তা করতে হত না। এখন উপরি পাওনা হয়েছে সেই গুরুভার বহন করার জন্য স্বামীর পাশে এসে একই সঙ্গে একই প্রক্রিয়াতে দৌড়ঝাঁপ করে উপার্জন করা। তবু 'মেয়ে' এই পৃথক ভাবটা মুছে গেল না আমাদের কপাল থেকে। 'মেয়ে' ডাকটা পুরুষের সঙ্গে শারীরিক বৈসাদৃশ্যের জন্য অবশ্যই থাকবে। কিন্তু পুরুষের পাশে মেয়েদের সমান আসনে বসাবার ব্যাপারে আমাদের সমাজ যথেষ্ট উদাসীন। বিশেষ করে পুরুষদের ঔদাসীন্য এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি। অবশ্য তার একটা সাধারণ কারণ সহজেই অনুমেয়। আমাদের এই পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার পেলে পুরুষদের কর্তৃত্বের কিছুটা হানি অবশ্যই হবে।

'মেয়ে কাগজের' বেলাতে ওই এক কথাই প্রযোজ্য। 'মেয়ে' বলেই একটা আলাদা জাতের, যার নামের মধ্যে মেয়েলিপনা প্রকাশ পেতে হবে! 'মেয়ে কাগজ' কথাটার গুরুত্ব কম। মেয়েলি কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই মেয়েদের একান্ত নিজের। মেয়েদের সাজসজ্জা স্বভাবতই মেয়েদের নিজস্ব। পুরুষের কাছেও তার মূল্য কম নয়। তবু দুঃখ হয় এই ভেবে পুরুষ মেজর জেনারেলের পাশে মহিলা মেজর জেনারেলের সমান সম্মান কাগজে-কলমে থাকলেও মনের ভেতর এক বাধা থেকে যায়। একটু যেন দূরে সরে থাকতেই হবে আমাদের। একথা যেমন সত্যি তেমনি মেয়েরা কোনো পত্রিকার মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন সমস্যা যদি সমাজকে জানাতে চায় তাহলেও প্রচ্ছন্নভাবে পুরুষদের তাচ্ছিল্যের ভাবই ফুটে ওঠে। উচ্চশিক্ষিত মহলে মুষ্টিমেয় কিছু মহিলা হয়ত তাঁদের প্রাপ্য সম্মান খানিকটা পান। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত মেয়েরা যাঁরা বহির্জগতে, অন্তঃপুরে দিনে দিনে তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে প্রকৃত সম্মান, শ্রদ্ধা পান ক'জন?

আমরা মেয়েরা বহু বছর ধরে অনেক কষ্ট করে, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে, বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আজ খানিকটা আলোর সন্ধান পেয়েছি। সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পুরুষের পাশে আজ আমরা চলতে শিখেছি। সমাজের চেহারার কোনো পরিবর্তন হয়নি এমন নয়। তবু যখন আজকের সমাজের বুকে গড়ে প্রায় রোজই একজন বধূকে পণের বলি হতে হচ্ছে, যৌতুক দিতে না পারার দরুন পাত্রপক্ষের কাছে নাজেহাল হচ্ছেন শিক্ষিতা মেয়ের বাবা-মা, আবার বহির্জগতে একই সঙ্গে নারীকে প্রতিযোগিতায় বসতে হচ্ছে পুরুষের সঙ্গে, তখন আমাদের সমাজ সচেতনতাকে ধিক্কার না দিয়ে পারি না।



ব্যংগচিত্র : শাহড়া



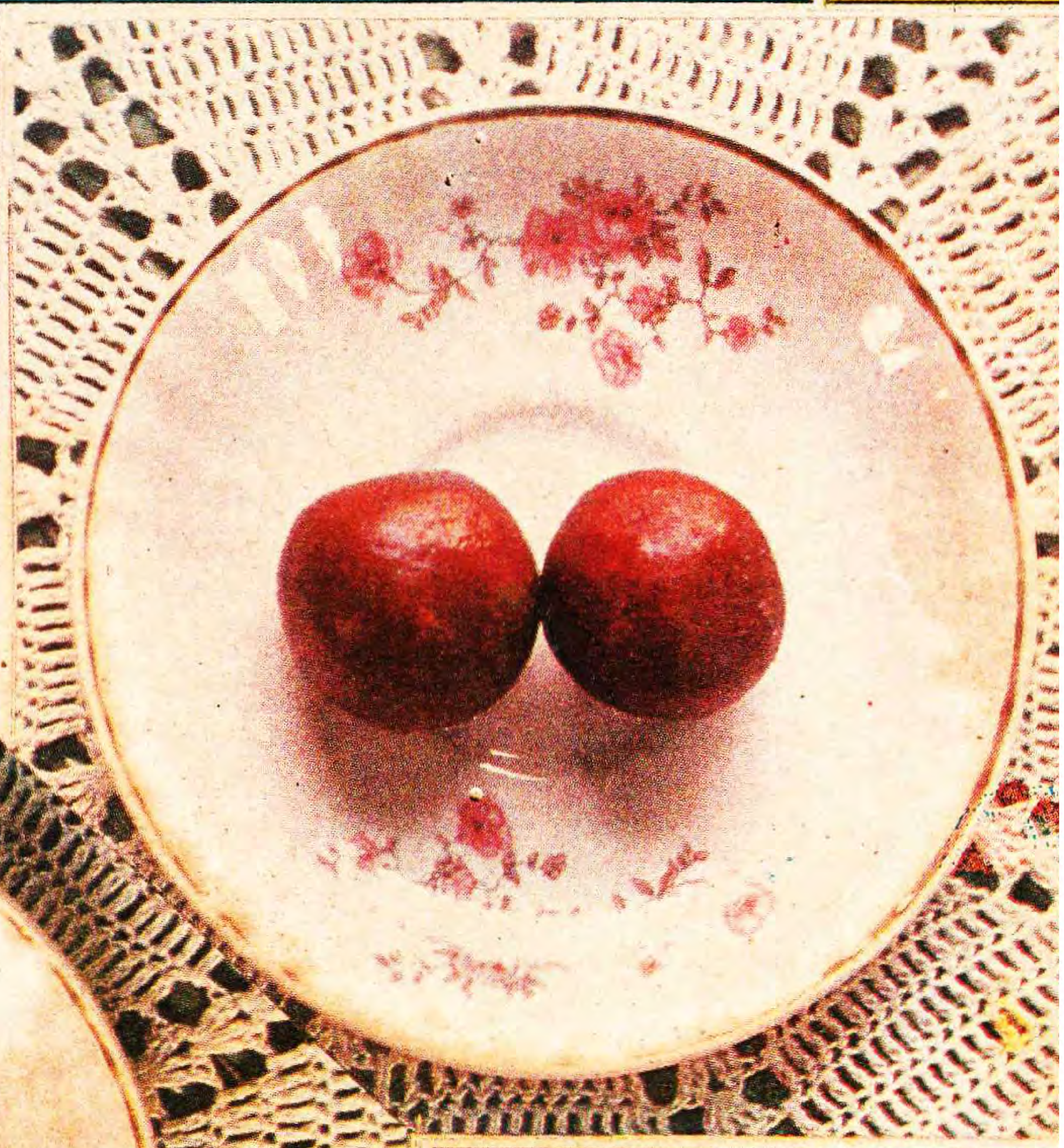
রান্না

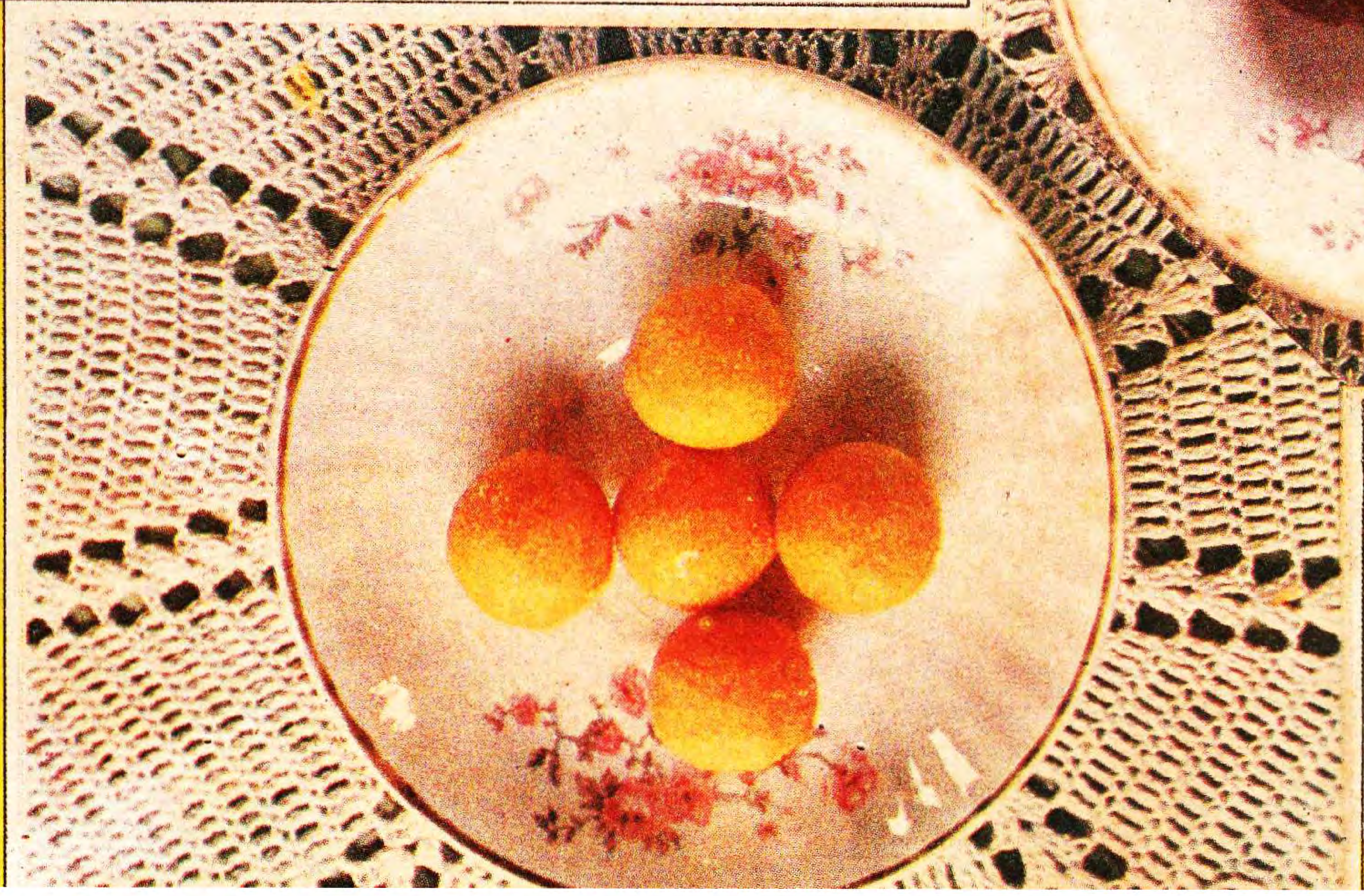
দই চিকেন

মুরগির মাংস – ১ কিলোগ্রাম
টক দই – ২০০ গ্রাম
পোস্ত – ১৫০ গ্রাম
কাজুবাদাম – ৫০ গ্রাম
নুন ও চিনি – পরিমাণমত
মাখন – ৫০ গ্রাম

পোস্ত ও কাজুবাদাম মিহি করে বাটতে হবে। দই ভালভাবে ফেটাতে হবে। এবার পোস্ত ও কাজুবাদাম বাটা, দই, নুন, চিনি মাংসের সঙ্গে মাখতে হবে। মাখা হলে একটা ডেকচিতে সব মাখনটা লাগিয়ে নিতে হবে। এবার মাখা মাংস ডেকচিতে ঢেলে চাপা দিতে হবে। অল্প আঁচে বসিয়ে রাখতে হবে। মাংস সেদ্ধ হলে নামিয়ে নিন! গরম গরম পরিবেশন করবেন।

ইচ্ছে হলে শুকনো লঙ্কা চিরে বিচিগুলো বাদ দিয়ে আর গোলমরিচ গুঁড়ো করে দিতে পারেন।





ট্যাংরা মাছের কারি

ট্যাংরা মাছ – ১০ টা
পেঁয়াজ – ২৫০ গ্রাম
রসুন – ১টা (বড়)
আদা – ৫০ গ্রাম
কাঁচালঙ্কা – ৮টা
নুন ও তেল – পরিমাণমত

টাটকা মাছ হলে না ভেজেও রান্না করা যায়। অনেকে আবার মাছ ভাজা না হলে খেতে পারেন না, সেজন্য মাছগুলো অল্প ভেজে নিয়ে রান্না করা যায়। পেঁয়াজ, রসুন, আদা বাটতে হবে। কড়াইতে তেল দিয়ে পেঁয়াজ, রসুন ও আদাবাটা বেশ করে ভাজতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে মাছগুলো, কাঁচালংকা চিরে ও নুন দিয়ে কষতে হবে। গ্যাস বা উনুনের আঁচ কমিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখতে হবে। আর কড়াইটায় একটা থালা বা ঢাকনা দিয়ে দেবেন। মাছ সেন্ধ হলে নামিয়ে নেবেন। প্রয়োজন হলে সামান্য জল দেওয়া যায়।

ক্ষীরের লুচি

ময়দা – ৩০০ গ্রাম
খোয়া ক্ষীর – ১০০ গ্রাম
চিনি – ৫০০গ্রাম
ঘি – ২০০ গ্রাম
ছোট এলাচ – ৮টি

প্রথমে চিনির রস করে রাখতে হবে। ময়দাতে পরিমাণমত ঘিয়ের ময়ান দিয়ে মেখে ভাল করে ঠাসতে হবে। ময়দা ঠাসা হয়ে গেলে ছোট ছোট করে লেচি কেটে রাখতে হবে। এবার ক্ষীরটাকে ভাল করে ঠেসে নিতে হবে। উনুনে বা গ্যাসে কড়া বসিয়ে তাতে ক্ষীর দিয়ে ৪ চামচে চিনি ও ৫/৬ টা ছোট এলাচ গুঁড়ো করে দিয়ে নাড়তে হবে। ক্ষীর নরম হলে নামিয়ে নিন। ময়দার লেচির মধ্যে ক্ষীরের পুর ভরে আলগা করে বেলে ঘিয়ে ভেজে রসে ফেলতে হবে। ৪/৫ মিনিট রসে রেখে অন্য পাত্রে তুলতে হবে।

ছোলার ডালের লেডিকেনি

ছোলার ডাল – ২৫০ গ্রাম
ময়দা – ১০০ গ্রাম
খোয়া ক্ষীর – ১০০ গ্রাম
চিনি – ১ কিলোগ্রাম
খাবার সোডা – চামচের দুই-তৃতীয়াংশ
এলাচ দানা – পরিমাণমত
বড় এলাচ – পরিমাণমত

প্রথমে ছোলার ডাল সেন্ধ করে নিতে হবে। ডাল জলের সঙ্গে মিশবে না অথচ সেন্ধ হয়েছে, এইরকম ভাবে সেন্ধ করতে হবে। তারপর ঝুড়িতে ঢেলে জল ঝরাতে হবে। জল ঝরে গেলে ডাল ভাল করে বাটতে হবে। এবার ময়দার সঙ্গে খাবার সোডা, পরিমাণমত ময়ান দিয়ে ডাল, ময়দা, ক্ষীর একসঙ্গে ভালভাবে মাখতে হবে। মাখা হয়ে গেলে ছোট ছোট লেচি কেটে একটা করে এলাচ দানা ও ২-৩ টে করে বড় এলাচের দানা ভেতরে দিয়ে গোল করে পাকাতে হবে। এবার ঘিয়ে ভেজে রসে ফেলতে হবে।

ভাপা সন্দেশ

ছানা – ১ কিলোগ্রাম
চিনি – ২৫০ গ্রাম
ভ্যানিলা এসেন্স – ২/৩ ফোঁটা

প্রথমে ছানা ভালো করে ঝাঁক দিয়ে জল বার করে দিতে হবে। তারপর ছানা শিলে মিহি করে বাটতে হবে। বাটা হয়ে গেলে চিনি ও ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে নিতে হবে। স্টিল বা অ্যালুমিনিয়ামের চ্যাপ্টা পাত্রে ছানাটা সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। পাত্রের মাপমত ঢাকা দিতে হবে। এবার গ্যাস বা উনুনে ডেকচি করে জল বসিয়ে তার ওপর ছানার পাত্রটি ঢাকা-সমেত বসাতে হবে। ডেকচির জল ফুটবে, ভাপে সন্দেশ তৈরি হবে। সন্দেশ তৈরি হয়েছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য কাঠি দিয়ে দেখতে হবে। কাঠির গায়ে ছানা না লাগলে বুঝবেন সন্দেশ তৈরি হয়ে গেছে। এবার ছুরি দিয়ে চৌকো করে কেটে ফ্রিজে ঢুকিয়ে দেবেন।

মুগের লাড্ডু

বেসন ১০০ গ্রাম
ঘি – ১০০ গ্রাম
চিনি – ১০০ গ্রাম
বড় এলাচ – পরিমাণমত

প্রথমে সবটুকু চিনি মিহি করে বাটতে হবে। এবার কড়াইতে ঘি দিয়ে বেসন ভাজতে হবে। ভাজা বেসন বাদামী রঙের হয়ে এলে কড়াই নামিয়ে ফেলবেন। একটু ঠান্ডা হলে বাটা চিনি ও বড় এলাচ গুঁড়ো করে, বেসনের সঙ্গে মিশিয়ে গোল করে পাকাতে হবে। যদি পাকাতে অসুবিধা হয় তাহলে সামান্য দুধ দিয়ে পাকাবেন।

বীথিকা দে



অসুখ বিসুখ

নারী শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জরায়ু, ডিম্বকোষ, কটিদেশ, স্তনযুগল গঠিত হয়েছে সন্তানের সৃষ্টি এবং পুষ্টির জন্য। নারী জীবনের গতিপ্রকৃতির বিবর্তন সন্তান ধারণের জন্য। দশ মাস দশ দিন মাকে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। দশ মাস দশ দিন পরে সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন মায়ের সঙ্গে শিশুর সংযোগ থাকে, নাড়িশিরার মাধ্যমে। নাড়িশিরা কেটে দেবার পরও নাভিমন্ডলে যে চিহ্ন সারাজীবন সন্তান বহন করে, তারই মধ্যে চিহ্নিত আছে মাতৃত্বের যন্ত্রণা এবং ব্যথা। একজন বিশ্ববিখ্যাত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ অভিমত পোষণ করেছিলেন, কোন সন্তান তাঁর মাকে কুকথা বলার আগে তিনি যেন তাঁর নাভিমন্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

নারী রজঃস্বলা হবার পর থেকে যতদিন রজঃ থাকে, তার মধ্যে যে কোনদিন গর্ভসঞ্চার হতে পারে। তবে তার একটা নিয়ম ও সময় আছে। যেদিন নারী ঋতুমতী হন, মানে যেদিন থেকে রজঃ শুরু হয়, যে কদিন রজঃ থাকে সে কদিনকে বলা হয় ব্লিডিং ফেজ। যে দিন রজঃর রক্ত বন্ধ হয়, সেদিন থেকে তেরো, চোদ্দ, পনেরো দিন পর্যন্ত বলা হয় প্রলিফারেটিভ ফেজ এবং তারপর থেকে পরবর্তী ঋতু হওয়া পর্যন্ত বলা হয় সিক্রিটিং ফেজ।

তাহলে দেখা যাক কেন রজঃস্রাব হয়? রজঃ বা মেনস্ট্রুয়েশন শুরু হবার দিন চার-পাঁচ আগে অর্থাৎ ঋতুচক্রের চব্বিশ পঁচিশ দিনের মাথায় যদি গর্ভসঞ্চার না হয় তাহলে জরায়ুর ফ্যালোপিয়ন টিউবের মধ্যে ওভামের মৃত্যু ঘটে। জরায়ুর আভ্যন্তরীণ স্তরকে বলা হয় এন্ডোমেট্রিয়াম। এন্ডোমেট্রিয়ামের তিন স্তর। একদম নিচের স্তর, যে স্তর জরায়ুর মাংসপেশীর (মায়োমেট্রিয়াম) সঙ্গে যুক্ত তাকে বলা হয় বেসাল লেয়ার, মধ্যের স্তরকে বলা হয় কমপ্যাক্ট লেয়ার এবং বাইরের স্তরকে বলা হয় স্পঞ্জি লেয়ার। ঋতুচক্রের চব্বিশ-পঁচিশ দিনের মাথায় গর্ভসঞ্চার না হওয়াতে ওভামের মৃত্যু ঘটে। ওভাম যে মুহূর্তে মৃত হয়ে যায়, সেই মুহূর্তে সমস্ত হরমোনগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে জরায়ুর অভ্যন্তরে সংকোচন ও আলোড়ন ঘটে এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের স্পঞ্জি লেয়ার ও কমপ্যাক্ট লেয়ার ছিঁড়ে যায়। সেই ছেঁড়া এন্ডোমেট্রিয়ামের লেয়ার রক্তের সঙ্গে রজঃ হিসেবে বেরিয়ে আসে। এই সময়ে জরায়ুর মুখ যাকে ইংরেজীতে বলে ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল অস, তা খুলে যায় এবং জরায়ুর অভ্যন্তর সরাসরিভাবে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় সাবধানতা অবলম্বন না করলে জরায়ুর মধ্যে যে কোন রকম ইনফেকশন হয়ে যেতে পারে। সেই জন্যে রজঃকালীন অবস্থায় অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হয় এবং বিশ্রাম নিতে হয়। আমাদের কুসংস্কার বলে এই সময় পূজাপার্বণে যোগ দিতে নেই, নারী এ সময়ে অশুচি এবং তাই তারা অতিরিক্ত রকমের নোংরা কাপড় ব্যবহার করে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বলতে হয়, এই সময়ে অত্যন্ত পরিষ্কার প্লাগ অথবা প্যাড ব্যবহার করা উচিত। খুব দৌড়ঝাঁপ না করাই ভাল কারণ অতিরিক্ত ব্লিডিং হবার সম্ভাবনা থাকে। পূজাপার্বণ বা উৎসব বাড়িতে না যাবার কারণ অশুচির জন্য নয়। এর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক কারণ, যেখানে অনেক লোকের ভিড় সেখানে বহু রকমের জীবাণু থাকে। কার কী রোগ আছে বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়। এই সময়ে যে কোন রোগের জীবাণু জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করে যেতে পারে। সেইজন্যে উৎসব বা ভিড় পরিহার করতে বলা হয়েছে।

রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবার পর আপনা থেকেই জরায়ুর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। প্রসবদ্বার অর্থাৎ ভ্যাজাইনা আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রসবদ্বারের ওপরের এক তৃতীয়াংশ অ্যালকালাইন, নিচের দুই তৃতীয়াংশ অ্যাসিড। ভ্যাজাইনার গাত্র স্কোয়ামাজ এপিথিলিয়াল সেল দিয়ে তৈরি তাই সহজে কোন জীবাণু প্রসবদ্বারে অথবা প্রসবপথে বাসা বাঁধতে পারে না। কোন ইনফেকশন হলে জরায়ুর সারভিক্স-এ হয়, আর তখন শ্বেতপ্রদাহ হয়।

শ্বেতস্রাব যে সব সময় ইনফেকশনের জন্যে হয়, তার কোন মানে নেই। অনেকসময় মানসিক টেনশনের জন্যে এবং ক্রমাগত কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্যে শ্বেতস্রাব হতে পারে। মানসিক দুশ্চিন্তা মস্তিষ্কের উপচেতন স্তরে চাপ (স্ট্রেস) সৃষ্টি করে এবং সেই চাপ জরায়ুর ওপরে সঞ্চারিত হয়। এই চাপের জন্য জরায়ুর সারভিক্স-এর কোষগুলি সংকুচিত হয়, ফলে কোষ থেকে রস বেরিয়ে আসে। এই রসই শ্বেতস্রাব। শ্বেতস্রাব হবার জন্য আবার দুশ্চিন্তা হয় এবং দুশ্চিন্তা থেকে আবার শ্বেতস্রাব হয়। একে বলা চলে ভিসিয়াস সাইকেল। এই ধরনের উপসর্গ সহজে সারতে চায় না এবং সমীক্ষায় দেখা গেছে গ্রাম্য মহিলা থেকে শহরের মহিলাদের এই রোগ বেশি হয়, কারণ শহুরে মহিলারা সংসারজীবনে ও কর্মজীবনে অনেক রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েন, যা গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে হয় না। শহরের জীবনযাত্রা গ্রামের চেয়ে জটিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাই শহরের মহিলাদের বেশি সাহসিনী হতে হবে। সাহসিনী অর্থে মারামারি কাটাকাটি করতে বলছি না, আমি বলতে চাইছি, সংসারের সমস্যাগুলিকে শক্ত হাতে নার্ভাস না হয়ে সমাধান করার চিন্তা করবেন এবং কোনমতেই দুশ্চিন্তা করবেন না। দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলে দেখবেন ননস্পেসিফিক লিউকোরিয়া আপনা থেকেই সেরে গেছে। কোন ডাক্তারবাবুর কাছে যাওয়ার দরকার হবে না।

কিন্তু সব শ্বেতস্রাব যদি মানসিক কারণে ঘটে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও কিন্তু ভুল হবে এবং রোগিণীর প্রতি অন্যায় করা হবে। সারভাইকাল এরিয়াতে ইনফেকশন হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, সাধারণত স্ট্রেপটোকক্কাস ও স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু আক্রমণে ইনফেকশন ঘটে। ওষুধ রক্তে প্রবেশ করে তারপর লিভারে যায়। লিভারের মধ্যে ওষুধগুলির বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে, তারপর রক্ত দিয়ে জরায়ুর শিরা উপশিরায় তা প্রবেশ করে। সেই ওষুধ তারপর জরায়ুর সারভিক্স-এর শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে জীবাণু ধ্বংস করার চেষ্টা করে। শরীরের এত দূর পরিভ্রমণ করার পর ওষুধের ক্ষমতা আর তত বেশি না থাকার জন্য জীবাণুগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। যে ডোজে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই ডোজে শারীরিক ক্ষতি হয় এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক উপসর্গ দেখা দেয়। সেইজন্যে মুখে ওষুধ খাইয়ে সচরাচর শ্বেতস্রাব রোগ সারানো যায় না।

শ্বেতস্রাব সারাতে হলে অঙ্গগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। অনেক রকমের ওষুধ সম্বলিত ক্রীম আছে, সেগুলি সকালে একবার স্নানের সময়, রাতে শোবার সময় প্রসবদ্বারের মধ্যে লাগিয়ে দিলে জীবাণুনাশক ওষুধগুলি সরাসরি সারভিক্স-এ গিয়ে লাগে এবং জীবাণুগুলো অল্পকালের মধ্যেই মারা যায়। ক্রীম লাগালে স্থানগুলি মোলায়েম থাকে এবং অযথা ইরিটেশন হয় না এবং ইরিটেশন না হওয়ার জন্যে কোষ থেকে রস নির্গত হবে না ফলে শ্বেতস্রাবও বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব লোকাল ওষুধ লাগানো বেশি উপকারী। মলম দেবার আগে স্থানগুলি অত্যন্ত সাবধানে এবং যত্নের সঙ্গে পরিষ্কার করে নিতে হয়। লাক্স সাবান দিয়ে অঙ্গ পরিষ্কার প্রয়োজন। লাক্স সফট সোপ। সফট সোপ চামড়ার ক্ষতি করে না এবং চামড়াকে মসৃণ রাখে। সামনে থেকে পেছন দিকে সাবান ব্যবহার করা উচিত। শুধু উচিত নয়, স্বাস্থ্যসম্মত। শরীরের মধ্যভাগের, নিম্নাংশের অ্যানাটমি ভেবে দেখুন। নিম্নাঙ্গের অর্থাৎ পেরিনিয়ামের অ্যানাটমি চিন্তা করুন। সামনের দিকে যৌনাঙ্গ, পশ্চাৎদিকে পায়ুদেশ। পায়ুদেশে একাধিক জীবাণু সবসময়েই থাকে। সাবানে জীবাণু মারা যায় না, সাবান পশ্চাৎদিক থেকে সামনের দিকে ঘষলে, জীবাণুগুলোও পেছন দিক থেকে সামনের দিকে চলে আসবে এবং প্রসবদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করবে। বি-কোলাই জীবাণু মলের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই থাকে, কিন্তু সেই বি-কোলাই ইউরিনারী ট্র্যাক্টে চলে গেলেই বি-কোলাই ইনফেকশন হয়। আমি বলতে চাই এক এক রকমের জীবাণু এক অঙ্গে যখন বাস করে তখন নিরীহ থাকে (ননপ্যাথোজেনিক) সেই জীবাণুই যখন অন্য অঙ্গে চলে যায়, তখন রোগসৃষ্টি করে (প্যাথোজেনিক হয়ে যায়)। মহিলারা এইজন্যে বি-কোলাই রোগে খুব বেশি এবং ঘন ঘন ভুগে থাকেন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে অনেক রকমের জীবাণু স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করে যায়। বি-কোলাই থেকে আরম্ভ করে ট্রাইকোমোনাস্

জীবাণু স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করে যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় মহিলাদের প্রসবপথে ট্রাইকোমোনিয়াসিস বার বার হয়, বি-কোলাইও বার বার হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী থেকে স্ত্রীর মধ্যে এই রোগ প্রবেশ করে। সেইজন্যে ট্রাইকোমোনিয়াসিস এবং বি-কোলাই রোগ হলে একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর চিকিৎসা করা উচিত।

ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগে শ্বেতস্রাব হয় এবং সেই স্রাবে খুব চুলকোয়। চুলকনির জন্য নখের মধ্যে যে জীবাণু থাকে, তা চুলকনির সঙ্গে ক্ষতের মধ্যে মিশে যায় এবং সেকেন্ডারি ইনফেকশন হয়ে যায়। সেইজন্যে ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগ হলে যত তাড়াতাড়ি পারেন, চিকিৎসকের কাছে যাবেন। এতে কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়। ট্রাইকোমোনিয়াসিস রোগের খুব ভাল ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে সেরে যায় এটা নিশ্চিত। ওষুধটির নাম মেট্রোনিডাজল। বইতে বা ওষুধ কোম্পানির লিটারেচারে যে ডোজে দিতে বলেন, সে ডোজে না দেওয়াই উচিত অনেক বেশিমাত্রার ডোজ সেখানে লেখা থাকে। আমেরিকা ইংলন্ড ও ইউরোপের মহিলা থেকে ভারতীয় মহিলাদের ধাত আলাদা রকমের শারীরিক অবয়ব বা কল্টুরও আলাদা রকমের। ভারতীয় মহিলাদের শরীরে মেদের আধিক্য। এটা কোন দোষ নয়। ভারতের প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে বড় হলে চর্বির আধিক্য হবেই এবং শরীরের স্নেহস্তর বেশি হবেই। মেদহীন শরীরে ওষুধ যত পরিমাণে দেওয়া হয়, মেদাধিক্য শরীরে সমপরিমাণের ওষুধ কাজ নাও করতে পারে। সেইজন্যে পাশ্চাত্য দেশের মহিলাদের যে পরিমাণে ওষুধ দেওয়া হয়, ভারতীয় মহিলাদের সেই পরিমাণে ওষুধ দেওয়া হয় না, অথচ বই বা কোম্পানির লিটারেচারে লেখা থাকে ইউরোপীয় মহিলার ডোজ। ভারতীয় মহিলাদের সকালে একটি সন্ধ্যায় একটি মেট্রোনিডাজল ২০০ মিলিগ্রামের বড়ি পাঁচ দিন খেলেই ট্রাইকোমোনিয়াসিস-এর শ্বেতস্রাব এবং চুলকনি সেরে যায়। তার বেশি খাবার দরকার নেই। অতিরিক্ত মাত্রার ওষুধ খাবারও দরকার নেই।

মেট্রোনিডাজল বড়ি রোগিণীকে দেবার আগে ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার মহিলা অন্তঃসত্ত্বা কি না। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই বড়ি সেবন করলে ভ্রূণের ক্ষতি হবে, অনেকসময় বিকলাঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অনেকসময় ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে এবং গর্ভপাত হয়ে যায়। গর্ভপাত হয়ে গেলে হাসপাতালে গিয়ে কিউরেট করিয়ে নেওয়া একান্ত দরকার। গর্ভপাত হয়ে যাবার পর, প্লাসেন্টার টুকরো জরায়ুর গায়ে লেগে থাকে। পরিষ্কার না করে নিলে প্লাসেন্টার টুকরো জরায়ুর মধ্যে পচে এক রকমের ক্যানসার হয়, যার নাম কোরিয়ন এপিথিলিয়াম। কিউরেট করে জরায়ুর মধ্যে থেকে যে পদার্থ বার হবে, সঙ্গে সঙ্গে তা পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। পরীক্ষায় ক্যানসার জাতীয় কোন দোষ পাওয়া গেলে তক্ষুনি তার চিকিৎসা করলে পেশেন্ট হয়ত বেঁচে যেতেও পারেন।

মেট্রোনিডাজল বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, সেইজন্যে এ ধরনের ওষুধ অত্যন্ত সাবধানে এবং সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করা উচিত।

বি-কোলাই ইনফেকশন মহিলাদের অত্যন্ত বেশি হয়। বিশেষ করে, বিবাহিতা মহিলাদের। বি-কোলাই ইনফেকশন হলে সাধারণত মূত্রনালীতে হয় এবং যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে বি-কোলাই জীবাণু মূত্রনালী দিয়ে মূত্রথলিতে যায় তারপর কিডনি বা বৃক্কতে ইনফেকশন ঘটিয়ে দেয়। কিডনিতে ইনফেকশন হলে নেফ্রাইটিস রোগ হয় এবং ক্রমশ কিডনি নষ্ট হয়ে যায়।

সেইজন্যে বি-কোলাই রোগ জটিল আকার ধারণ করার আগেই চিকিৎসার প্রয়োজন।

বি-কোলাই রোগের উপসর্গগুলি হল ঘুসঘুসে জ্বর, বার বার মূত্রত্যাগ। প্রত্যেক বারই মনে হবে পরিষ্কারভাবে মূত্রত্যাগ হচ্ছে না। মূত্রনালীতে জ্বলন থাকে তার সঙ্গে চুলকনিও থাকে। এই ধরনের উপসর্গে সবচেয়ে আগে দরকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা। তারপর দিন সাতেক অ্যালকাসল, লেকলাইট বা ইলেকট্রাল জাতীয় ওষুধ দিনে তিনবার খেলে উপসর্গগুলির অনেক উপশম ঘটে। বি-কোলাই জীবাণু অ্যাসিড মিডিয়াতে বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে। যে ওষুধগুলির নাম করা হয়েছে সেগুলি সিসমেটিক অ্যালকাইলাজার, তার মানে, ওষুধগুলির যে কোন একটা খেলে অন্ত্র থেকে রক্তের মধ্যে মেশে এবং রক্তকে অ্যালকালাইন করে দেয়। সেই অ্যালকালি কিডনি দিয়ে যখন বেরিয়ে আসে, মূত্রকেও অ্যালকালাইন করে দেয়। মূত্র অ্যালকালাইন হয়ে গেলে বি-কোলাই জীবাণু বাঁচতে পারে না অথবা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। কয়েকদিন এক নাগাড়ে ইউরিনকে অ্যালকালাইন করে রেখে দিলে বি-কোলাই জীবাণুগুলি দুর্বল হয়ে যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে ওষুধগুলি খুব বেশি খাবেন না এবং বেশি দিন ধরে খাবেন না। রক্তের মিডিয়াম যদি অ্যালকালাইন-এর দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে তাহলেও শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার গোলমাল হয়ে যায় — যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় অ্যালকালোসিস্। ওষুধগুলির মাপ হচ্ছে চা চামচের দু চামচ ওষুধ আধ গ্লাস জলে ভাল করে মিশিয়ে সকালে একবার, দুপুরে একবার রাতে একবার সাতদিন খাবেন। সাতদিনে যদি না কমে বা সারে, তাহলে অতি অবশ্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন এবং তাঁকে জানাবেন আপনি সাতদিন অ্যালকালি খেয়েছেন কারণ অনেক ওষুধ অ্যালকালি মিডিয়াতে কাজ করে না।

ভিষক আচার্য

বিচিত্র বিশ্ব

চা বয়কট

পশ্চিম রাজস্থানের মরুভূমি অঞ্চলের গ্রামবাসীরা গত এক বছর ধরে চা পান না করার শপথ রক্ষা করছেন। এই গ্রামের বয়োবৃদ্ধরা সকলকে এই শপথ গ্রহণ করিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, অধিকাংশ যুবক-যুবতী চায়ের কাপ নিয়ে গল্পগুজবে সময় নষ্ট করছে। সেই সময়টা বাড়ির অন্যান্য কাজে ব্যয় করা যায়।

এক বছর আগেও যেখানে চা খাওয়া প্রায়-অভ্যাস ছিল সেখানে আজ একজনও চা ছোঁয় না। এর ফলে চায়ের দোকানও অদৃশ্য হয়েছে। একটিমাত্র চায়ের দোকান আছে, তাও রেলস্টেশনে। সেখানে চা পরিবেশন করা হয় শুধুমাত্র বহিরাগতদের। গ্রামের গোয়ালাদের চায়ের দোকানে দুধ বিক্রি করা নিষেধ।

অভিনব এই অভিযান প্রথম শুরু হয় বারমার জেলায়। এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে জয়সলমীর, বিকানীর, জালোর, সিরোহি, যোধপুর, পালি এবং নগৌর জেলায়। এই ছড়িয়ে পড়ার জন্য কোনো প্রচারের বা কোনো নেতার প্রয়োজন হয়নি। যে গ্রামে এই খবর পৌঁছেছে, সেখানে গ্রামবাসীরা নিজেরাই একত্রে জড়ো হয়ে এই শপথ নিয়েছেন।

প্রত্যেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চা ছেড়ে দিয়েছেন, তবুও কেউ লুকিয়ে চা পান করলে তার জন্য আর্থিক দণ্ড এবং সামাজিক বয়কটের শাস্তিবিধান আছে। তবে বিদেশী অতিথিদের চা খাওয়ানো যেতে পারে।

বৃদ্ধদের বিশ্ববিদ্যালয়

ঠাকুমা, দিদিমা, দাদুরা এখন আর নাতি-নাতনীদের নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন না। এখন তাঁদের জন্য খোলা হয়েছে এমন এক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে তাঁরা যে কোনো পেশার উপযুক্ত শিক্ষা নিতে পারেন। ১৯৮২ সালে বৃদ্ধদের বিভাগটি চালু করেছেন ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়। এখন ওখানে প্রায় ছয়শোজন ছাত্রছাত্রী আছেন। তার মধ্যে বয়সে যিনি কনিষ্ঠ তাঁর বয়স তেতাল্লিশ, আর সবচেয়ে বেশি বয়সের ছাত্রটির বয়স ছিয়াশি।

'বয়স্ক নাগরিকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়'-এ সম্পূর্ণ নতুনভাবে পড়ানো হয়, যাতে বৃদ্ধরা নিজেদের ছাত্র বলে ভাবতে পারেন এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যও সফল হয়। দেখা গেছে এইসব ছাত্রছাত্রী বয়সজনিত নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক সমস্যার হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন।

আইন, মনস্তত্ত্ব, ঈশ্বরবাদ, কৃষিবিজ্ঞান এইসব বিষয়ের সঙ্গে বৃদ্ধদের নানা সমস্যার দিক নিয়েও আলোচনা করা হয় এখানে।

সমীক্ষা করে জানা গেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা পঁচাত্তর ভাগই মহিলা ছাত্রী। যাঁরা একসময় সংসারের চাপে পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন, আজ তাঁরাই নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য এগিয়ে এসেছেন।

[উপন্যাস : দূরের কাছে : ২৮ পৃষ্ঠার পর]

'ঠিক তাই।' বলে হাসতে হাসতে নেমে গেলেন ক্যাথারিন।

গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে, পোশাক বদলে সুভদ্র জানলার পর্দা সরিয়ে আকাশের অবস্থাটা দেখতে চাইল। বোঝা যাচ্ছে আজ আকাশ অমন মুখ ভার করেই থাকবে। কলকাতার আকাশে শরৎ এখন নীলে টান টান হয়ে আছে। জানলার কাচ খুলতেই হুহু ঠাণ্ডা বাতাস।

এরপর নিচে এসে টেবিলে বসে সুভদ্র যখন খেতে শুরু করল, জুলি বেরিয়ে গেল তার জরুরী কাজে। জুলি কি সত্যিই তার এখানে অতিথি হওয়াটা ভাল চোখে নেয়নি? নাকি ওর নিজের ভেতরকার কোনো গোলযোগ ওকে ভেতরে ভেতরে বিষণ্ণ করে রেখেছে?

ক্যাথারিন বললেন, 'সুবোধ যখন লণ্ডনে আসে তখন ওর বয়েস—তোমার এখন যা বয়েস তার চেয়ে একটু বেশি।'

'হ্যাঁ, শুনেছি, বাবার চাকরির চার বছরের মাথায় ওঁর কোম্পানি ওঁকে এখানে ট্রেনিং নিতে পাঠায় এক বছরের জন্য।'

'আমারও বয়েস তখন—এখন জুলির যা বয়েস তার চেয়ে খানিকটা বেশি।'

সুভদ্র বলল, 'আমার ঠাকুরমার মুখে ওঁর জীবনের শেষের দিকে—আপনার কথা খুব শুনেছি। রোগশয্যায় ঠাকুরমা আপনার নাম ধরে ডাকতেন মাঝেমধ্যে। বলতেন, আমার ক্যাথারিনকে দেখার বড় সাধ। এ জন্মে তার সঙ্গে আর দেখা হল না। ক্যাথারিন কিন্তু আমায় কথা দিয়েছিল সে আবার আসবে। দেখা করে যাবে আমার সঙ্গে।'

সুভদ্র লক্ষ্য করল, ঠাকুরমার কথায় চোখ ছলছল করে উঠল ক্যাথারিনের। বড় করে নিঃশ্বাস নামিয়ে ক্যাথারিন বললেন, 'দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল, তবু মনে হয় এই তো সেদিন। পরে বুঝেছি আমায় কত ভালবাসতেন উনি। আমার নিজের মা ছাড়া আর কোনো মহিলাকে আমি কখনও অমন আপন করে পাইনি। অথচ কলকাতায় ছিলাম যখন অনর্থক কত রাগ করেছি ওঁর ওপর। ক্ষুব্ধ হয়েছি, ভেবেছি বৃদ্ধা প্রতি মুহূর্তে আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন।'

ওভেন থেকে হামবার্গার গরম করে আনলেন ক্যাথারিন। সুভদ্র বলল, 'আমি আপনার সম্পর্কে জেনেছি অনেক পরে। ছোটবেলায় শুধু দেখেছি, বিলেত থেকে এক ভদ্রমহিলা বছরে দু-একটা চিঠি লেখেন বাবাকে। আপনার কথা প্রথম সবিস্তারে শুনি যখন, তখন আমি স্কুল পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছি। এক বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার আমায় বলেছিলেন। উনি আপনাকে নিয়মিত ইঞ্জেকশন দিতে আসতেন আমাদের বাড়িতে।'

কিছুটা সময় ক্যাথারিন আর কোনো কথা বললেন না। সুভদ্র বুঝতে পারল, স্মৃতির অনেক ছবি ক্যাথারিনের মনের তলা থেকে ওপরে উঠে আসছে। সুভদ্র অনুভব করল, ওই ছবিগুলোর প্রতি ক্যাথারিনের আলাদা একটা মমতা আছে। এরপর ক্যাথারিন খুব ধীরে ধীরে বলতে থাকলেন, 'দেখ, সবসুদ্ধ মিলিয়ে সুবোধের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ষোল মাসের আর তোমাদের বাড়ির সঙ্গে মাত্র চার মাসের। লণ্ডনে এক বছর মেলামেশার পর তোমার বাবার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হল তখন তো সে কলকাতায় ফেরার মুখে। তোমার বাবা আমায় তখনই কলকাতায় নিতে চায়নি। তখন এপ্রিল মাস। আমায় ডিসেম্বরে যেতে বলেছিল। আমার মা-বাবাও তাতে সায় দিয়েছিলেন। আমিই জেদ করে তখনই ওর সঙ্গে চলে গেলাম।'

হঠাৎ যেন প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যেই সুভদ্র বলে উঠল, 'আচ্ছা, জুলি কি আমার এখানে এসে ওঠাটাকে খুব ভাল মনে নেয়নি?'

'না না, ব্যাপারটা এভাবে দেখ না। তখন বললাম না ওর জীবনে একটা দুর্ঘটনা আছে। জীবনের প্রতি ওর দৃষ্টিভঙ্গিটাই হয়ে পড়েছে নেগেটিভ। মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্কে বিশ্বাস নেই ওর। জানি না, কোনোদিন ও আর জীবনের দিকে সহজ করে তাকাতে পারবে কিনা!'

তিন

ঘণ্টাচারেক গাঢ় ঘুমের পর সুভদ্র দোতালায় নেমে দেখল ক্যাথারিন টি ভি-র সামনে বসে আছেন। সুভদ্রকে আসতে দেখে ক্যাথারিন সাউণ্ডটা কমিয়ে দিয়ে বললেন, 'এস বোস। খানিক আগে আমি ওপরে গিয়েছিলাম। তুমি তখন গভীর ঘুমে।'

'আপনি কষ্ট করে বারবার ওপর-নিচ করবেন না কিন্তু। প্রয়োজন মত তো আমিই নেমে আসব।'

'ওপর-নিচ করতে আমার কিন্তু একেবারেই অসুবিধে হয় না। তোমাদের দেশের মত, এখানে তো আর চাইলেই বাড়িতে কাজের লোক পাওয়া যায় না। দেখবে খুব বুড়োবুড়িরাও এখানে নিজের কাজ নিজে করছে। এ অভ্যেসটা আমাদের রাখতেই হয়।'

সুভদ্র খুঁটিয়ে দেখছিল ক্যাথারিনকে। সুভদ্রর বাবা এবং ক্যাথারিনের বয়সের ব্যবধান সামান্য। কিন্তু চেহারায় সুবোধ রায়কে অনেক বেশি বয়স্ক মনে হয়। সুভদ্রর মা তো ক্যাথারিনের চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন। শেষের দিকে মায়ের শরীর ভেঙে গিয়েছিল অনেকটা। সুভদ্রর ছোটপিসিকেও এখন মনে হবে ক্যাথারিনের তুলনায় অনেক বেশি বয়স।

ক্যাথারিন সম্পর্কে বাবা কিংবা ঠাকুরমার যেমন একটা নরম মন লক্ষ্য করেছে সুভদ্র, ছোটপিসির মানসিকতা তার উল্টো দেখেছে। ক্যাথারিন সম্পর্কে ছোটপিসিকে স্পষ্ট বলতে শুনেছে, 'দাদার আজও ওর সম্পর্কে একটা সফট কর্নার আছে। সেও বছরে একটা দুটো চিঠি লেখে দাদা এবং বৌদিকে। কিন্তু আমার তো মনে হয় ক্যাথারিন যে দাদাকে বিয়ে করে এদেশে এসেছিল, তার পেছনে অন্য রকমের আশা ছিল ওর। সুবোধ রায়—পুরনো জমিদার পরিবারের ছেলে—এই শুনেই ক্যাথারিন নিশ্চয়ই মনে মনে আশা করেছিল ইণ্ডিয়ার ছোটখাটো একটা রাজপরিবারের বউ হয়ে আসছে ও। কিন্তু কলকাতায় এসে বাস্তব অবস্থাটা দেখে ক্যাথারিন নিজের ভুল বুঝতে পারে। আর তাতেই ওর মাথা বিগড়ে যায়।'

অথচ ক্যাথারিনের ফিরে আসার ব্যাপারে বাবা এবং ঠাকুরমার কাছ থেকে অন্য ছবি পেয়েছে সুভদ্র। তাই ক্যাথারিন সম্পর্কে একটা কৌতূহল ক্রমশ বেড়েছে সুভদ্রর মধ্যে।

এখন সে জানতে চাইল, 'ঔদ্ধত্য যদি না মনে করেন তো একটা প্রশ্ন করব। বাবা এবং আপনার ছাড়াছাড়ির কারণ হিসেবে যেটা সবাই জানে তা হল কলকাতার গরম আপনার একেবারেই সহ্য হয়নি। কিন্তু সেটাই কি একমাত্র কারণ? আপনার দিক থেকে সূক্ষ্ম আর কোনো বাধা কি ছিল না? আপনার মুখ থেকে আমাদের ঠাকুরমা সম্পর্কে দু-একটা কথা শোনার পর থেকে প্রশ্নটা আরো তীব্র হয়ে উঠছে আমার মধ্যে।'

স্নিগ্ধ হাসি ছড়াল ক্যাথারিনের মুখের রেখায়। বললেন, 'ঠিকই ধরেছ তুমি। কলকাতায় তোমাদের বাড়িতে গিয়ে সুবোধের আচরণে খুব আহত হয়েছিলাম। দেখতাম সব কিছুতেই ও মার অনুমতি নিতে চায়। যা কিছু কথা বলতাম, বলত মাকে একবারটি বলে নাও। এতে আমার আঁতে ঘা লেগেছিল খুব। তখন আমার কেবল মনে হতে লাগল সব কিছুতেই কেন ওই বৃদ্ধার অনুমোদন লাগবে? আশ্চর্য!'

'আচ্ছা, ঠাকুরমার কাছে শুনেছি, কলকাতা থেকে লণ্ডনে ফিরে এসে আপনি বাবাকে বারবার চিঠি লিখেছেন লণ্ডনে এসে স্থায়ীভাবে থাকার জন্যে। ওদিকে বাবা এবং ঠাকুরমার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি আর দ্বিতীয়বার কলকাতায় যেতে রাজি হননি।'

'তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ কি অসহ্য অবস্থায় কলকাতা ছেড়েছিলাম আমি। সেকথা ভাবতেই আমি আঁৎকে উঠতাম।'

সুভদ্র শুনেছে সবই। তার বিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার বাবা কিংবা

মা, ঠাকুরমা কিংবা পিসিরা কেউ কোনদিন তাকে ক্যাথারিনের কথা জানায়নি। তারপর সুভদ্র নিজেই যখন হঠাৎ একদিন জানতে পারল বৃদ্ধ এক কম্পাউণ্ডারের কাছ থেকে, তখন এবং তারপরে বাবা ও ঠাকুরমার কাছ থেকে অনেক কথা শুনেছে একটু একটু করে।

ছোটবেলা থেকেই ক্যাথারিন খুব জেদি, আবেগচালিত। কোনো কিছু একটা মাথার মধ্যে ঢুকলে এক ধরনের খেপামি পেয়ে বসে তাকে। সুবোধ রায়ের সঙ্গে বিয়ের পর সে যখন ঠিক করে সেই এপ্রিলেই সে সুবোধ রায়ের সঙ্গে কলকাতায় যাবে—তখন কারো উপদেশ অনুরোধ তাকে ঠেকাতে পারল না। বহু য়ুরোপীয় নারী যদি দিনের পর দিন গরমের কলকাতায় থাকতে পারে, সে পারবে না কেন?

কিন্তু কলকাতায় পা দিয়েই ক্যাথারিন বুঝতে পেরেছিলেন ওই তীব্র তাপ সহ্য করা তার শরীরের ক্ষমতায় কুলোবে না। পাখার ব্লেড থেকে দুপুরে আগুনের হলকা ছুটছে যেন!

দুপুরবেলায় সুবোধ রায় থাকতেন অফিসে। বাড়িতে গরমে ছটফট করতেন ক্যাথারিন চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে কাঁদতেন ক্যাথারিন কখনো কখনো। অসহায় শাশুড়ি বরফ ঘষতেন তাঁর মেমবৌমার গায়ে। উপায় না দেখে সুবোধ রায় বাড়িতে ক্যাথারিনের ঘরটায় এয়ারকুলার লাগানোর ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যেন দলবেঁধে এসেছিল ওই সময়ে। প্রথমত এয়ার-কুলারটা বসাতেই অকারণ কটা দিন দেরি হল। তারপর দুদিন চলল বেশ। এরপর আচমকা সুবোধ রায়দের এলাকার ট্রান্সফরমারটাই গেল খারাপ হয়ে সেটা সারাতে দুদিন। ক্যাথারিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

এরপর অবস্থা আরো খারাপ হল। কদিন পরে এয়ারকুলারটাই খারাপ হয়ে গেল। সেটাকে সারাতে গেল আরো কটা দিন। খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন ক্যাথারিন। গরমে তার শরীরে ফোস্কার মত র‍্যাশ উঠতে লাগল। সে বছর খরাও ছিল ভয়ঙ্কর রকমের। বর্ষা এসেছিল অনেক দেরিতে। ততদিনে ক্যাথারিনের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা চরমে উঠেছিল।

এরপর বর্ষা নামল যখন মারাত্মক রকমের ডিসেণ্ট্রিতে ভুগতে হল। ক্যাথারিনের শরীর কিছুতেই যেন কলকাতার জল-হাওয়া নিতে চাইছিল না। মা-বাবাকে ক্যাথারিন চিঠিতে লিখলেন—আমি মরতে বসেছি। ক্যাথারিনের বাবা-মা কলকাতায় এলেন। কদিন থাকলেন। ডাক্তারেরা বলেছিলেন, এখন অসুখটা শুধু ওর শরীরে নয়, মনেরও। ক্যাথারিনের বাবা-মা আর দেরি না করে মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছিলেন লণ্ডনে। দু পক্ষের কিছুদিন ধরে চিঠি লেখালেখি চলল। এরপর আপসে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল। খুব কাছাকাছি সময়েই সুবোধ রায়ের আবার বিয়ে হল কলকাতায়। ক্যাথারিন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন আর একজন ভারতীয়কে। ডাক্তার মেহেরাকে। লণ্ডনের স্থায়ী বাসিন্দা তিনি। এদিকে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও কলকাতা-লণ্ডনের চিঠি যাওয়া-আসা করত বছরে দু-চারটে করে।

এখন কফি তৈরি করতে করতে ক্যাথারিন বললেন, 'এখন বুঝতে পারি অল্প বয়সের সেই দিনগুলোতে আমার মানসিক ভারসাম্যের অভাব ছিল। শুধু আবেগে চলতাম তখন। কোনো ঘটনাকেই শান্ত মনে স্থির হয়ে বিচার করার এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না আমার মধ্যে। তোমাদের দেশের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে যে তোমাদের দেশের পারিবারিক মানসিকতাকে আমার বোঝার দরকার ছিল—সেটা অনুভব করিনি সেদিন।

'তুমি অধ্যাপক মানুষ, তোমায় আর বলার দরকার পড়ে না, আমাদের আর তোমাদের বিয়ের তফাতটা। আমাদের দেশে বিয়ে হয় শুধু একটি নারী এবং একটি পুরুষের মধ্যে—কিন্তু তোমাদের দেশের বিয়ে মানে তো দুটো পরিবারের মিল হওয়া।'



সুভদ্র একবার ভাবল ক্যাথারিনের কথার মাঝখানে কথা বলে কিন্তু ক্যাথারিন যেন নিজের বলার মধ্যেই মগ্ন হয়ে আছেন দেখে সে আর কিছু বলে না।

ক্যাথারিন বলে চলেছেন, 'পরে ভেবেছি, তোমার ঠাকুরমা সেই সরল শান্ত, একান্ত ঘরোয়া মানুষটি তো ওই চার মাসের একটি দিনও আমার কোনরকম ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাননি। শুধু ওঁকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া—এ তো প্রায় গাছের কাছে বলে নেওয়ার মত নির্বাধ ছিল।'

দরজার বেল বাজল এই সময়। সুভদ্র নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল। জুলি এসেছে।

চার

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর, জানলার পর্দা সরিয়ে ভোরের লণ্ডনকে দেখছিল সুভদ্র। বেশ লাগছিল। এত বড়, এমন তীব্র ব্যস্ত শহর অথচ ঘনবসতির এই লোকালয়গুলো কেমন শান্ত, ছিমছাম, নিঃশব্দ। কুয়াশা ছড়ানো চারিপাশে। রাস্তার লাইটপোস্টে আলো-গুলো জ্বলছে তখনো। সোনালি আভার আলো। উইলেসড্রেনগ্রীনের ওই পেছনের রাস্তা দিয়ে একটি দুটি গাড়ি বা দু-একজন পায়ে হাঁটা মানুষ দেখা যাচ্ছে মাঝে-মধ্যে। মিল্ক ভ্যান থেকে, একটি তরুণী, দুটো তিনটে করে দুধের বোতল রেখে যাচ্ছে বিভিন্ন বাড়ির বন্ধ দরজার সামনে। কিছু পরে একটি লোক খবরের কাগজও রেখে গেল একই-ভাবে। পেছনের বাড়ির সবুজ কার্পেটের মত লনে একটা স্প্যানিয়েল ছোটাছুটি করছে।

সুভদ্র দোতালায় নেমে দেখল ক্যাথারিন ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলেছেন। জুলিও ওই সময় টেবিলে এসে বসল। সুভদ্রকে দেখে 'মর্নিং' সম্ভাষণ করল মাপা হেসে। প্রায় একই সঙ্গে ক্যাথারিনের 'মর্নিং মর্নিং'। দুজনকে প্রতিসম্ভাষণ জানাতে জানাতে সুভদ্র চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

ক্যাথারিন বললেন, 'আজ রবিবার। আগামীকাল থেকে তোমার সেমিনার শুরু। আজকের দিনটা তুমি জুলিদের সঙ্গে ঘুরে নাও খানিকটা।'

জুলি বলল, 'তোমার প্রথম কাজ হল সাতদিনের টিকিট কেটে নেওয়া। ওটা কেটে রাখলে সারা সপ্তা ধরে তুমি খুশিমত টিউব এবং লাল রঙের সরকারি বাসে চড়তে পারবে।'

অনেকগুলো খবরের কাগজ পড়েছিল টেবিলে। সুভদ্র জুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কাগজ কোনটা?'

জুলি একটা কাগজ তুলে এগিয়ে দিল সুভদ্রর দিকে। সুভদ্র কাগজ দেখতে থাকলে জুলি বলল, 'আমি গোটা কয়েক ফোন সেরে নিই। দেখি বব এবং ক্রেস্টেলাকে ধরতে পারি কি না।' বলে জুলি উঠে গেল।

তিনের পাতার নিচের দিকে একটা দাঙ্গার খবরের ওপর চোখ পড়ল

সুভদ্র। সাদা-কালোর দাঙ্গা। একটি কেনিয়ান যুবকহত্যার প্রতিশোধ নিতে একটি সাদা চামড়ার তরুণীকে ধর্ষণ করে কয়েকটি কালো চামড়ার যুবক। তার উত্তরে তিনজন কালো চামড়াকে দিনের আলোয় রাস্তার ওপর গুলি করে মেরেছে এক শ্বেতকায় যুবক।

কাগজ থেকে চোখ তুলে সুভদ্র প্রশ্ন করে, 'এখানে কি মাঝে-মধ্যেই সাদা-কালোর দাঙ্গা বাধে?'

'ইস্ট এণ্ডে লাগে মাঝে-মধ্যে। ওসব গুণ্ডা শ্রেণীর মধ্যেই চলে।'

'কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মার খায় তো নিরীহ মানুষ।'

'সে তো সব দাঙ্গারই ফল।' বলে ক্যাথারিন এক মুহূর্ত থামেন। তারপর সাবধান করার গলায় সুভদ্রকে বলেন, 'লণ্ডনের পথে পথে যেমন ভালো মানুষও চলে তেমনি বদমায়েশের তো অভাব নেই। দুনিয়ার সেরা মানুষেরা যেমন জড়ো হয় এখানে, তেমনি সবচেয়ে বজ্জাত লোকদেরও আস্তানা এখানে। একা যেখানে-সেখানে যেও না।'

ব্রেকফাস্ট সেরে পোশাক বদল করে জুলির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল সুভদ্র। জুলি গায়ে চাপিয়েছে আজ লাল আর সাদা ফারের কোট। যে মেয়ের আগ্রহ নেই তেমন তাকে নিয়ে ঘোরার—শুধু মায়ের অনুরোধ রেখে যাচ্ছে যে—তার সঙ্গে ঘোরাটা রীতিমত অস্বস্তিকর। অথচ ক্যাথারিন কখনোই চাইবেন না সুভদ্র একা ঘুরুক।

উইলেসডেনগ্রীন থেকে প্রথম টিউবে চাপল সুভদ্র। ছুটির দিন, লণ্ডনের টিউব বেশ ফাঁকা। ট্রেনে উঠে জুলি আর সুভদ্র পাশাপাশি বসল।

প্রতিটি কামরাই ঝকঝকে। যে কোনো আসনে বসলেই উল্টো-দিকের আসনের মাথার দেওয়ালে দেখতে পাবে লণ্ডনের টিউব রেলের মানচিত্র। এক একদিকের লাইনের এক একটি রঙের নামে পরিচয়। ইয়োলো লাইন, গ্রীন লাইন এই রকম।

ট্রেনে বসে খুব নিরাসক্ত গলায় জুলি লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশনাল জিয়োগ্রাফি সেমিনার নিয়ে আলোচনা করে গেল। সুভদ্রর পেপারের বিষয় কি? কতজন প্রতিনিধি যোগ দিচ্ছে এই সেমিনারে! এ ধরনের সেমিনারের ভালর দিক, মন্দর দিক। শেষে বলল, দেখি পারি যদি তাহলে আমাদের কাগজের হয়েই একদিন চলে যাব তোমাদের সেমিনারে।

সুভদ্র জানতে চাইল, 'আমরা এখন চলেছি কোথায়?'

'ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে।'

'তারপর?'

'শোনো ওখানে নেমে তোমাকে বাসে তুলে দেব। ছাদখোলা দোতালা বাসে বসে তুমি একচক্কর লণ্ডন ঘুরে নেবে। সেই ফাঁকে আমি আমার টুকটাক দু-একটা কাজ সেরে নেব এবং বন্ধুদের নিয়ে আসব। তোমার বাস ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে পৌঁছনোর আগেই আমরা ওখানে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। কেমন?'

'আচ্ছা কাগজে যে সাদা কালোর দাঙ্গার খবর দেখলাম?'

'ও কিছু নয়। বড় শহরে কিছু না কিছু একটা ঝামেলা সব সময় লেগেই থাকে। বাসে তোমার কোনো ভয় নেই। বিপদের সম্ভাবনা থাকলে আমি তোমায় পাঠাতামও না।'

'না, না, আমি সে সব কিছু ভাবছি না।'

দেখতে দেখতে আজ লণ্ডনের আবহাওয়া বেশ ভাল হয়ে উঠল। হালকা রোদ্দুর ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। দেখে বোঝা যায় এই দুর্বল রোদ্দুরের আয়ু বেশি সময় নয়। তবু তাতেই হেসে উঠছে লণ্ডন।

ছাতখোলা দোতালা বাসের ওপরে বসে লণ্ডনের প্রধান দর্শনীয় জায়গাগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরতে বেশ ভাল লাগছিল তার। এখন টেমসের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে বাস। নদী সুভদ্রর প্রিয় বিষয়। সেমিনারে সুভদ্র গঙ্গা অববাহিকার ওপর পেপার পড়বে। পেপারটা তার আকর্ষণীয় হয়েছে বলেই মনে হয়। বাসের মাথায় চেপে লণ্ডন ভ্রমণে সুভদ্রর সবচেয়ে ভাল লাগল মহারানীর প্রাসাদ দরজায় প্রহরীবদল। প্রতি একঘণ্টা অন্তর অশ্বারোহী প্রহরীদের বদল হয়। পাথরের মূর্তির মত ঘোড়ার ওপর সুসজ্জিত হয়ে সার দিয়ে নিশ্চল হয়ে থাকে ওরা। চেঞ্জ অব গার্ডসের মুহূর্তে চোখের পলকে স্থানবদল করে ঘোড়ার পিঠের প্রহরীদের সঙ্গে নিচে দাঁড়ান প্রহরীরা। যন্ত্রের মত একসঙ্গে।

সুভদ্র ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে ফিরে এসে দেখল জুলি তার বন্ধুদের নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। জুলি ছাড়া আরো তিনজন রয়েছে। ওদের মধ্যে একজন নিগ্রো। ওর কথা আগের দিনই শুনেছিল সুভদ্র জুলির মুখ থেকে। ওর নাম বব। ভাল গান গায়। গীটার বাজায়। জুলির সঙ্গে একই কাগজের অফিসে চাকরি করে।" অন্য দুজন য়ুরোপীয়ান—একজন ক্রিস্টেলা, অন্যজন ভেরাদিয়ে। জুলি ওদের সকলের সঙ্গে সুভদ্রর পরিচয় করিয়ে দিল।

পাঁচজনে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাব-এ গিয়ে ঢুকল। পাব-এ না বসলে সত্যিকারের ইংরেজকে পাওয়া যায় না। অন্য সব জায়গায় সে নিজেকে আড়াল করে রাখে কিন্তু পাব-এর আড্ডায় তার অন্য চেহারা।

পাব-এ বসেই ঠিক হয়েছিল আজ ওরা টেট গ্যালারি দেখতে যাবে। ভেরাদিয়ের সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশি হয়েছে সুভদ্র। তারই সমবয়সী এই ফরাসী যুবকটি কলা সমালোচক হিসেবে এর মধ্যেই বেশ খানিকটা নাম করেছে। প্রাচীন স্থাপত্যচর্চার ওপর ওর দু ভাল্যুমের বইও বেরিয়েছে সম্প্রতি। এরকম একজন লোককে সঙ্গে করে টেট গ্যালারি দেখার আনন্দ আলাদা।

টিকিট কেটে টেট গ্যালারিতে ঢুকেই প্রথমে যে প্যাসেজটা—তার মধ্যে রঁদ্যার 'দি কিস' ভাস্কর্যটা দেখে খুব খুশি হল সুভদ্র। এটা নিয়ে সে কথা বলতে পারে। কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমির রঁদ্যা প্রদর্শনীতে এটা দেখেছে সে। এ নিয়ে আলোচনাও পড়েছে।

রঁদ্যার ভাস্কর্য দেখতে কেমন ভিড় হয়েছিল কলকাতায়, জলে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টিতে ভিজে কিভাবে লাখো মানুষ তা দেখে তারিফ করেছে সুভদ্র তার বিবরণ দিল ভেরাদিয়েকে। বাকি সকলেও শুনল।

ভেরাদিয়ে ছবি যে খুব ভাল বোঝে তার পরিচয় পাওয়া গেল ওর বিভিন্ন ছবি ব্যাখ্যার মাধ্যমে। শুধু ব্রিটিশ পেইণ্টার নয়, পিকাসো, মাতিস, ডালি থেকে শুরু করে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের পেণ্টারদের কিছু বিখ্যাত ছবি আছে ওখানে।

ঘুরতে ঘুরতে জুলিকে লক্ষ্য করছিল সুভদ্র। সকলের সঙ্গেই ও কথা বলছে, হাসছে, তবু তার মধ্যে থেকেই মাঝে মাঝে ওর একাকিত্বটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পাঁচ

সেমিনার শুরু হওয়ার পর তৃতীয় দিনে জুলি এসে দেখা করল সুভদ্রর সঙ্গে। অফিস থেকে সেমিনারে আসার সুযোগটা সে করে নিয়েছে। গঙ্গা নদী কিংবা তার অববাহিকা সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই জুলির। তার বাবা ভারতীয় হলেও জুলির বাবার দিক থেকে ভারতের সঙ্গে আর কোনো রকমের যোগাযোগ নেই। মারও থাকার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য, মার সঙ্গে ওদেশের যোগাযোগ যেন আর ছিঁড়তেই চায় না। শুধু সুবোধ রায়ের সঙ্গে বছরে একটা দুটো চিঠি বিনিময়ে নয়, অনেক দিক থেকেই রয়ে গেছে যোগটা। জুলির এটা পছন্দ নয়।

কিন্তু বাবা জীবিত থাকতেই জুলি লক্ষ্য করেছে কলকাতা থেকে চিঠি এলেই মা যেন কেমন হয়ে পড়েন। বাবার প্রতি মার ভালবাসার কোনো অভাব ছিল না, কর্তব্যবোধ সম্পর্কে ক্যাথারিন সবসময়ে খুব সতর্ক, কিন্তু যত বয়স বাড়ছিল ততই কেমন ভারতবর্ষের দিকে ঝোঁক বেড়ে যাচ্ছিল তার। একটা আধ্যাত্মিক টান ক্রমশ বাড়ছিল। বাবার

মৃত্যুর পর এটা আরো তীব্র হল।

শেষ বয়সে এসে মা কি আবার তার পুরনো স্বামীকে ফিরে পেতে চায়? কলকাতার ওই বাঙালী বৃদ্ধ কেন ইনিয়েবিনিয়ে এখনো প্রেমপত্র লেখে মাকে? এই বয়সে ওই বৃদ্ধের তার মাকে এমন কি প্রয়োজন? জুলি কোনো পুরুষকেই বিশ্বাস করে না। নিজের প্রয়োজন ছাড়া, স্বার্থসিদ্ধি করা ছাড়া পুরুষ কখনো আসে না নারীর কাছে। আর পুরুষের প্রয়োজন মানে তো একটাই।

কলকাতা থেকে ওই বৃদ্ধের ছেলে, জিয়োগ্রাফির এক লেকচারার লণ্ডনে এক সেমিনারে আসছে এবং মায়ের একান্ত অনুরোধে সে উঠছে তাদেরই বাড়িতে—শুনে প্রথমেই খুব চটে গিয়েছিল জুলি। সে ঠিক করেছিল ওই ক'দিন লণ্ডনে সে থাকবে না। অফিস থেকে লম্বা ছুটিও নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু একটু একটু করে ক্যাথারিন কিভাবে যেন তাকে বেঁধে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত মার কথা সে ফেলতে পারল না, সুভদ্র রায় আসলে, মনে মনে যতই বিরক্তি থাক, মুখে বা আচরণে সে সৌজন্যের অভাব রাখবে না এই কথা দিয়েছিল মাকে।

সুভদ্র রায় নামে কলকাতার এই তরুণ অধ্যাপকটিকে দেখার পর, তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর, যুবকটিকে তার অসহ্য বলে মনে হয়নি। কটা দিন বই তো আর নয়। মার অনুরোধেই সুভদ্রকে সঙ্গ দেওয়া এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

সুভদ্র রায়ের মাঝারি গড়নের চেহারার মধ্যে এক ধরনের ভারতীয় মাধুর্য আছে। কণ্ঠস্বর বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ, ওর ইংরেজী বলার মধ্যে আলাদা একটা স্বাদ আছে! বিশেষ করে ভেরীদিয়ের যখন খুব বন্ধুত্ব হল সুভদ্রর সঙ্গে, জুলি নিশ্চিত হল যুবকটি শুধুমাত্র বই মুখে করা মানুষ নয়, চিন্তাভাবনায় যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। সেমিনারে এসে সুভদ্রকে যেন আরো অন্যদিক থেকে দেখতে পেল জুলি।

সেমিনারের ব্রেকে সুভদ্র জুলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল ওই সেমিনারের কয়েকজন প্রতিনিধির। সুভদ্র এমন ভাবে বলল, যেন জুলির সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয়! সুভদ্রর আন্তরিকতার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই বোঝা যায়।

সেমিনারের কটা দিন সুভদ্রকে থাকতে হয়েছিল সেমিনারের প্রতিনিধিদের জন্যে ব্যবস্থা করা হোটেলে। হোটেলরুম থেকে হাঁটাপথের দূরত্বে সেমিনার হল। আর একদিন জুলিকে সুভদ্রর ওখানে যেতে হল ভেরীদিয়েরকে নিয়ে। অবশ্য ভেরীদিয়ের সঙ্গে সেখানে অতক্ষণ ধরে সুভদ্রর যে সাদা-কালোর দাঙ্গা এবং তারই সূত্রে আজকের ইংল্যাণ্ডের অর্থনীতি এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেটা জুলির আদৌ ভাল লাগেনি।

ওইদিনই ভেরীদিয়ে তুলেছিল প্রস্তাবটা। সামনের শুক্রবার সুভদ্রর সেমিনার শেষ শনিবার একদল বন্ধু মিলে যাওয়া যেতে পারে ব্ল্যাকপুলে আলোর সাজ দেখতে। প্রতি বছর এই সময়টায় ব্ল্যাকপুলে একমাস ধরে চলে 'ইলুমিনেশন ফেস্টিভ্যাল'।

শুক্রবার সন্ধের মুখটাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর রাস্তার ঠাণ্ডায় যেন আর বের হওয়া যায় না। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। মুহূর্তের মধ্যে নাকের আগা যেন বরফকুচি হয়ে যাচ্ছে। লণ্ডন শহরের এখন একটা আলাদা চেহারা।

সেদিনই সেমিনারের শেষ অধিবেশন হয়ে গেছে। হোটেলরুম ছাড়েনি সেদিন কোনো প্রতিনিধিই। সুভদ্র শুধু রুম ছেড়েছিল। চলে এল উইলেসডেনগ্রীনের জুলিদের বাড়ির সেই আড়াইতলা ঘরে।

কাগজের প্রথম পাতার নিচের দিকে সেদিন খবর ছিল হ্যাকনিতে সাদা-কালোর জোর দাঙ্গার। সুভদ্রর খুব ইচ্ছে করছিল একদিন ইস্ট এণ্ড ঘুরে আসার। ওই অঞ্চলকে নিয়েই নাকি যত ঝামেলা।

ইস্ট এণ্ডে সুভদ্র যেতে চাইছে শুনে ক্যাথারিন বললেন, 'ঘুরতে চাইলে দিনের বেলা সবাই মিলে একদিন ঘুরে এস। এমনিতে কোনো ভয় নেই,



তবে ঝামেলার কথা তো কিছু বলা যায় না। বদ লোকেরা সব সময়েই একটা কিছু গণ্ডগোল বাধাবার তালে থাকে।'

ব্ল্যাকপুলে আলোর সাজ দেখতে যাওয়ার দলটা বেশ বড় হল। উইলেসডেনগ্রীন থেকে ওদের গাড়িতে গেল পাঁচজন। বার্মিংহামে ওদের সঙ্গে যোগ দেবে আরো একটা গাড়ি। তাতে যাবে আরো চারজন।

লণ্ডন থেকে ব্ল্যাকপুল অনেকটা পথ। উত্তর সাগরের কোল ঘেঁষে ওই ছোট্ট শহরটা একেবারে স্কটল্যাণ্ডের সীমানায়। ইলুমিনেশন ফেস্টিভ্যালে শনিবারগুলোতেই ভিড়টা বেশি হয় ওখানে। শনিবার সকালে বেরিয়ে সারাদিন গাড়ি চালিয়ে রাতে ব্ল্যাকপুলে পৌঁছনো। তারপর আলোর সাজ দেখে রাতেই আবার ব্ল্যাকপুল থেকে ফেরার পথ ধরলে রবিবার সকালে লণ্ডনে।

জুলি ড্রাইভ করল শুরুতে। গাড়িতে ওঠার সময় ববকে দেখা গেল বেশ আগেভাগে গিয়ে জুলির পাশের আসনটায় বসে পড়তে। পেছনের আসনে মাঝখানে বসেছে ক্রিস্টেলা। পেশীবহুল কালো পাথরের মত শরীরটাতে বব চাপিয়েছে টকটকে লাল রঙের পুলোভার, গাঢ় হলুদ ট্রাউজার্স আর ঘন সবুজ টুপি। সেদিন টেট গ্যালারি দেখতে গিয়ে সুভদ্র ঠিক বুঝতে পারেনি কি পরিমাণ হুল্লোড় করতে পারে বব। সারাক্ষণ মুখে হাসি, ঝকঝকে দু-পাটি দাঁত বেশিরভাগ সময়ই দেখা যাচ্ছে। কথা বলার সময় হাতের নানারকমের মুদ্রা করে বব। সারাক্ষণ ইয়ার্কি করে, বেশিরভাগ সময়েই সামান্য অশ্লীলতার দিকে ঝুঁকে, তবে মাত্রা বাঁচিয়ে চলে সব সময়েই।

লণ্ডন শহর পেরিয়ে গাড়ি ফ্রীওয়ের ফাঁকা রাস্তায় পড়তেই জুলি ববকে গান ধরতে বলল। দ্বিতীয়বার আর বলতে হল না; গলা ছেড়ে উদ্দাম গলায় গান শুরু করে দিল বব। ভেরীদিয়ে আর সুভদ্র ওদের আগের দিনের আলোচনা, 'সাদা-কালোর দাঙ্গা' প্রসঙ্গ থামিয়ে গান উপভোগ করল।

গান গাইতে গাইতে বব মাঝে-মধ্যে জুলির দিকে ঝুঁকে পড়ছিল, কাঁধে হাত রাখছিল, কোমর জড়িয়ে ধরছিল কখনো কখনো। আলতো ভর্ৎসনা করছিল জুলি। হাসতে হাসতে বলছিল, এরকম করলে এক্ষুনি একটা অ্যাক্সিডেন্ট বাধিয়ে বসবে।

শুধু জুলির দিকে নয়, ক্রিস্টেলার দিকেও মাঝে-মধ্যে ঝুঁকে পড়ছিল বব। ক্রিস্টেলার এত কাছে মুখ নিয়ে আসছিল ও যে যে কোনো সময়ে অনায়াসে ক্রিস্টেলার টুকটুকে গালে চুমু ছুঁড়ে দিতে পারে।

বিশাল ফ্রীওয়ে ধরে চলেছে লাইন দিয়ে গাড়ির মিছিল। বেশিরভাগ গাড়িই ছুটছে ছুটির দিনের আউটিংয়ের মেজাজ নিয়ে।

রোড সাইড এক কফি পার্লারের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কফি খাওয়া শুরু করতেই বব বলল, 'আমার কিন্তু খিদে পেয়ে গেছে। জানোই তো বাপু, আমার খিদেটা একটু বেশি।'

ভেরাদিয়ে তাকে আশ্বাস দেয়, 'বার্মিংহামে পৌঁছতে তো আর বেশি দেরি নেই। একটু ধৈর্য ধর, তারপর মনের সাধে খিদে মিটিও ওখানে।'

ছয়

বার্মিংহামের হসপিটালটার পেছন দিকে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ডাক্তারদের কোয়ার্টার্স। একতলা বাড়ি। সামনে বড় চত্বর। ফুলের বাগান। রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে।

কফি খাওয়ার পর বাকি রাস্তাটুকু গাড়ি চালিয়েছে ভেরাদিয়ে। জুলির সঙ্গে ভেরাদিয়ের পরিচয় কাগজের অফিসেই। নিয়মিত না হলেও ভেরাদিয়ে মাঝে-মধ্যে চিত্র সমালোচনার পাতায় লেখালেখি করে। বেশ একটা সৌম্য সৌন্দর্য আছে ভেরাদিয়ের মুখের আদলে। সব সময়েই নামানো গলায় কথা বলে। কথা বলার মধ্যে সরসতা থাকে অনেকখানি। বাদামি চুল, সামান্য লম্বা জুলফি, ঘন ঘন বিয়ার খেতে ভালবাসে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে ভেরাদিয়ে বলল সুভদ্রকে, 'এখানে লণ্ডনের শরৎকে পুরোপুরি পাবে কটা দিন। এরপরই অবশ্য শুরু হবে হলুদ পাতার ঝরে যাওয়ার দিনগুলো। ওইসব দিনের মধ্যে এক ধরনের বিষণ্ণতা হয়ত আছে, তবু কেন যেন ওই সময়ের নিসর্গদৃশ্য আমার বড় ভাল লাগে। রায়, তুমি দেশে ফেরার মুখে সে দৃশ্য দেখে যেতে পারবে মনে হয়।'

গাড়ি পার্ক করে ওরা এগিয়ে গেল ডাক্তারদের কোয়ার্টার্সের দিকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেট পেরিয়ে লম্বা করিডোর। দুপাশে সারি সারি ডাক্তারদের ঘর। এখানে সর্বকিছুর রঙ সাদা। দেওয়ালের রঙ, আসবাবপত্তর, পোশাক, এমনকি বেয়ারাদের জুতো পর্যন্ত।

এগিয়ে গিয়ে ক্রিস্টেলা একটা দরজায় বেল দিতেই একটি রূপসী যুবতী দরজা খুলে দিল। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল চৌকনো ঘরের মধ্যে আরো একটি যুবতী এবং দুটি যুবক বসে আছে। ক্রিস্টেলা ঘরে ঢুকতেই ওরা হৈ হৈ করে উঠল।

ঘরের মধ্যে যে যুবতী বসেছিল, সুভদ্র তাকিয়েই বুঝতে পারল বাঙালী। নাম অনুরাধা সোম। আর যে যুবতীটি দরজা খুলে দিল—সে সাবিনা। মা জার্মান, যুবক দুজনের মধ্যে একজন ফারুক—মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ, অন্যজন দিল্লির ছেলে গুরতেজ সিং। চারজনই ডাক্তার।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আলাপ হতেই প্রথম কিছুটা সময় লাগল।

ফারুক বলল, 'তোমাদের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমরা তো ভিডিও দেখার ব্যবস্থা করছিলাম!'

বব বলল, 'আগে তো আমাদের জন্যে কিছু খাবার ব্যবস্থা কর।'

'অবশ্যই। এক্ষুনি আনছি।' জানিয়ে বেরিয়ে গেল অনুরাধা।

ভেরাদিয়ে জানতে চাইল, 'ভিডিওতে কি দেখবে ভাবছিলে তোমরা?'

'ভিডিও ফিল্মটা আমাদের দেশের বেলি ডান্সিংয়ের ওপর।' ফারুক জানাল।

বব অমনি লাফিয়ে উঠল, 'বেলি ডান্স! ওহ্ ফ্যান্টাসটিক। আমরা দেখব। চালাও ভাই।'

ভেরাদিয়ে হেসে বলল, 'কিন্তু খিদেটা না মিটিয়ে নিলে তোমার নিজের আবার অন্য ধরনের বেলি ডান্স শুরু হয়ে যাবে না তো?'

ভেরাদিয়ের কথা বলার ধরন দেখে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

অল্প সময়ের মধ্যেই অনুরাধা সোম একটি বেয়ারাকে সঙ্গে করে সকলের জন্যে খাবার নিয়ে এল। হট ডগস আর হামবার্গার, তার সঙ্গে ইতালিয়ান পিৎসা। গুরতেজ হাত বাড়িয়ে খাটের তলা থেকে বিয়ারের পেটি বার করল। ক্যান তুলে নিল যে যার খুশিমত।

ভেরাদিয়ের মাধ্যমেই অনুরাধা সোমের সঙ্গে জুলির পরিচয়। অনুরাধা সোমের রূপের আলাদা টান আছে একটা। শ্যামলা রঙের ওপর ভারী মায়াময় দুটো চোখ। বড় বড় পাতাওয়ালা আয়ত দুটো চোখের তাকানোর মধ্যে অন্য স্বাদের একটা গভীরতা আছে। অনুরাধা যে শাড়িটা পরেছে, জুলি জিজ্ঞাসা করে জানল ওগুলোকে টাঙ্গাইল বলে। অনুরাধার খোলা চুল কোমর পর্যন্ত নামানো। একটা কারুকাজ করা শাল জড়ানো গায়ে। অনুরাধার কথা বলার ভঙ্গিমার মধ্যে বেশ ছন্দ আছে। শাড়ির রঙের সঙ্গে মানিয়ে ও দু ভুরুর মাঝখানে হলুদ টিপ পরেছে।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর, বব-এর অনুরোধে ভিডিওটা চালানো হল বেলি ডান্সের ওপর তোলা ছবিটাতে অসাধারণ পারদর্শিনী আরব তরুণীটির নাচ সকলে দেখল মুগ্ধ হয়ে। অ্যারাবিয়ান টিউনেও আছে এক মাদকতা। রক্তের ভেতরে যেন নেশা নেমে আসে। শরীরের কোষে কোষে ছড়াতে থাকে মধুর শিহরণ।

ছবি চলতে চলতে বিয়ারের অনেকগুলো ক্যান শেষ হয়ে গেল প্রথম থেকেই গুরতেজ বারবার সাবিনার ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। কিন্তু সাবিনাকে আদৌ উৎসাহী মনে হল না।

ভিডিও শেষ হওয়ার পর ফারুক বলল, 'এবার চলো, দু দলে ভাগ হয়ে দুটো গাড়িতে বসি আমরা। বেশি দেরি করলে ব্ল্যাকপুলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে অনেকটা। রাতের খাওয়াটা আমরা কোনো রেস্টুরেন্টে সেরে নেব।'

বব চেঁচিয়ে বলল, 'দেখো, সব মেয়ে আবার যেন এক গাড়িতে জড়ো হয়ো না। সৌন্দর্যের সমান ভাগাভাগি থাকাই ভাল।'

এবার এক গাড়িতে অনুরাধা, জুলি, ভেরাদিয়ে আর সুভদ্র। ভেরাদিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। পাশে অনুরাধা। পেছনের আসনে জুলির পাশে সুভদ্র বসেছে।

অনুরাধা ফরাসি বলতে পারে অনর্গল। কিন্তু ভেরাদিয়ে একটা দুটো বাংলা শব্দ ছাড়া ভাষাটা সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। এই মুহূর্তে গাড়ি চালানো এবং পাশে অনুরাধাকে অনুভব করা ছাড়া ভেরাদিয়ের কাছে বাকি দুনিয়াটাই আড়াল হয়ে গেছে।

জুলি ফরাসি জানে না। তাছাড়া ভেরাদিয়ে আর অনুরাধা নিজেদের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে কি কথা বলছে তা শোনার আদৌ কোনো আগ্রহ নেই জুলির। বেঁচে থাকতে হলে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ দরকার, তাই পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে জুলি। কিন্তু সেটুকুও নেহাত ওপর ওপর। একটু আন্তরিকতা দেখাতে গেলেই মানুষ, বিশেষ করে পুরুষ মানুষ তার সুযোগ নেয়। জীবনে কোনো রকমের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। জেনেশুনেও যারা প্রশ্রয় দিতে চায়, দিক।

দু পাশে সবুজ প্রান্তর ও গাছগাছালি। পথের ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর পাব বা রেস্টুরেন্ট। আর আছে পেট্রল পাম্প। খানিক পরে কুয়াশা আরো গাঢ় হয়ে এলো।

ফ্রীওয়ের মাঝ বরাবর রাস্তার বুকের ওপর লাইন করে কয়েক হাত অন্তর আলো জ্বলছে। রাস্তার তলের সঙ্গে মিশে আছে ওই সোনালি আলোর কাচ। এমন শক্ত আর পুরু কাচ দিয়ে তৈরি ওগুলো যে ওর ওপর দিয়ে ভারী গাড়ি চলে যেতে পারে। সুভদ্র রাস্তার মাঝখানে জ্বলে থাকা ওই আলোগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জুলি বলল, 'এগুলোকে বলে ক্যাটস আই। এই যে দেখছ রাস্তা ক্রমশ এখন ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে, এখন তো রাস্তায় দু হাত দূরের কিছুও দেখা যাবে না। পথ কিভাবে কোনদিকে বেঁকে গেছে বোঝা যাবে না, যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তখন এগুলোই সবচেয়ে বেশি কাজে দেয়। যে ভদ্রলোক এই ক্যাটস আইয়ের পেটেন্ট বানিয়েছিলেন, কোটিপতি হয়ে গেছেন এর দৌলতে।'

সুভদ্র হেসে বলল, 'এই প্রথম তুমি খানিকটা সহজ হয়ে কথা বললে, অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর। আমি লক্ষ্য করেছি বেশির ভাগ সময়ই তুমি নিজের মধ্যে কেমন যেন গুটিয়ে থাকো। এতে নিজেকেই আমার কেমন অপরাধী মনে হয়। মনে হয় তোমাদের

বন্ধুত্বে জড়াবার আসাটাই তোমার পক্ষে বিরক্তিকর হয়েছে। নেহাত দায়ে পড়ে সঙ্গ দিচ্ছ।'

জুলি বলল, 'এটাই আমার প্রকৃতি। হয়তো এই জন্যেই সকলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ওপর ওপর, সেই অর্থে কেউই আমার খুব কাছের মানুষ নয়।'

সাত

কয়েক ঘণ্টা একটানা গাড়ি চালানোর পর ওরা যখন একটা ছোট্ট শহরের মধ্যে ঢুকল, একটু হাত-পা ছড়িয়ে কফি খাওয়ার জন্যে ছোট একটা বিরতি দেওয়া হল বড় গোছের একটা রেস্টুরেন্টের সামনে। ভেতরে ঢুকে দেখা গেল লোক থিকথিক করছে। বাচ্চাদের ভিড় যেমন আছে তাদের মা-বাবাদের সঙ্গে, তেমনি ভিড় আছে টীনএজারদের।

জুলি আর সুভদ্র একটি বড় টেবিলের সামনে দুটো ফাঁকা চেয়ার পেয়ে বসল। অন্যরা সব ছড়িয়ে ছড়িয়ে বসেছে কফির কাপ নিয়ে। পাশাপাশি বসেও জুলি আর সুভদ্র কোনো কথা বলতে পারল না ওদের টেবিলের বাকি চারটে চেয়ারে বসা চারজন আঠার-উনিশ বছরের ছেলের হুল্লোড়ের দাপটে। ওই চারজন ছেলেকে ঘিরে আরো তিনজন। ওই একই বয়সের ছেলে দাঁড়িয়ে হ্যা হ্যা করে হাসছিল।

শুনতে না চাইলেও ওদের আলোচনার বিষয় কানে আসছিল। লণ্ডনের সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে নিম্নবিত্ত পরিবারের এই বয়সের বকে যাওয়া টীনএজাররা। ছেলেগুলোর কথায় বোঝা গেল ওই ছেলেগুলো সব রঙের কাজ করে। বাড়ির দরজা জানলায় রঙের কাজ। অনেক সময়ে অনেক উঁচু উঁচু বাড়িতে উঠে রঙ করতে হয় ওদের। ওই রকম কোনো এক উঁচু বাড়িতে রঙ করতে উঠেছিল ওদের মধ্যে দুজন। যে ছেলেটি জোর গলায় গল্প বলছিল সে আর তার পাশের ছেলেটি। ভরদুপুর বেলায় কার্নিসে দাঁড়িয়ে রঙ করতে করতে ওরা গরাদেহীন খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল একটা ঘরে। বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের এক ভদ্রমহিলা ডিভানে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলেন সেই ঘরের মধ্যে। এই রঙের কাজ করা ছেলে দুটো কিভাবে সেই ভদ্রমহিলাকে তখন উপভোগ করেছিল হাসতে হাসতে তারই বর্ণনা দিচ্ছিল। ওরা দুজন কিভাবে মহিলাটির পোশাক খুলল, কিভাবে তাকে নিয়ে ডিভান তোলপাড় করল নানান অঙ্গভঙ্গি সমেত সেসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা দিচ্ছিল একটি ছেলে। বাকিরা উৎকট রকমের হাসছিল।

আশপাশের অনেকেরই কানে যাচ্ছিল কথাগুলো; কিন্তু কেউ তাকাচ্ছিল না ওদের দিকে; প্রবল হাসির শব্দ শুনেও গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছিল। জুলি আর সুভদ্র তাড়াতাড়ি কফি শেষ করে উঠে পড়ল।

ব্ল্যাকপুল শহরে ঢোকার মুখে গাড়ির এত ভিড় যে এগোনো মুশকিল হয়ে পড়ল। মাঝরাত পর্যন্ত গাড়ি আসছে কাতারে কাতারে। ছোট শহরটার প্রধান চওড়া রাস্তাটায় এক হাত পরিমাণ জায়গাও ফাঁকা নেই।

কাছাকাছি পৌঁছে দুটো গাড়ি থেকে সকলে নামল না। এখানে খালি গাড়ি রেখে যাওয়ার বিপদ আছে। দল বেঁধে ছোকরারা এখানে হামলা করে। এক বিষয় নিয়ে হামলা শুরু হবে তার পরিণতি হয়তো হবে অন্য বিষয়ে। তাছাড়া দাঙ্গার হাওয়া যখন একটা আছেই তখন সাবধান থাকা ভাল। একটা গাড়িতে ভেরনিয়ে আর অনুরাধা থাকল, অন্য গাড়িতে ব্যাকসীটে শুয়ে থাকল ফারুক।

লাখ লাখ বাল্ব দিয়ে সাজানো হয়েছে আলোর বিচিত্র আলপনা। কোথাও লাইন দিয়ে আলোর মোটর গাড়ি, কোথাও বা সারি সারি আলোর কুকুর, অন্য আর এক জায়গায় আলোর মোটর বাইকের মিছিল। এইভাবে একের পর এক সমুদ্রের ধার দিয়ে যে পথটা চলে গেছে টানা ব্ল্যাকপুলের মধ্য দিয়ে—তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আলোর বাহার।



জুলিরা দুজনে মিলে অনেকটা ঘোরাঘুরির পর, সমুদ্রের পাড়ে, খানিকটা উঁচুতে—একটা রেলিং দেওয়া চত্বরে এসে বসল কিছুটা সময়।

কাছে দূরে আরো কিছু যুবক-যুবতী বসে আছে। সমুদ্রের ওপর অন্ধকার। অন্ধকারে জেগে আছে শান্ত সমুদ্র। নাকের আগায়, ঠোঁটের ওপর হিম-হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

জুলি হঠাৎ সুভদ্রকে একান্তে বলল, 'শুনেছি, ভারতীয়রা প্রেমে, দাম্পত্য জীবনে খুব একনিষ্ঠ হয়। আমার বাবাকেও তাই দেখেছি। আর সেই জন্যেই তোমার বাবার ব্যাপারটা জানো, আমার কাছে অন্যরকম লেগেছে! আমার মার যেমন তোমার বাবার প্রতি টান কোনদিনই মোছেনি, মুছবেও না তেমনি তোমার বাবারও চিরকালই গভীর একটা টান থেকে গেছে আমার মার প্রতি। আচ্ছা, এর ফলে তোমাদের পারিবারিক শান্তিতে, মানে তোমার বাবা আর মায়ের মধ্যে—কোনরকম চিড় ধরেনি।'

'একদিনও নয়। তুমি জানো নিশ্চয়, আমার মার সঙ্গেও তোমার মার একটা মধুর সম্পর্ক ছিল চিঠিতে চিঠিতে।'

'জানি।' তবু পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে ভারী অদ্ভুত লেগেছে।'

'দূর থেকে এই প্রীতির সম্পর্ক বজায় থাকায় ডক্টর মেহেরা—মানে তোমার বাবা কি কখনো অশান্তি করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছেন। একবার নয়, বহুবার। কিন্তু মাকে কখনো টলানো যায়নি। এজন্যে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বাবার একটা অভিমান ছিল।'

'বুঝেছি। আর একারণেই বোধহয় তোমারও একটা বিরূপ মনোভাব আছে আমাদের বাড়ি সম্পর্কে।'

'দ্যাখো, আমি বুঝে পাই না যে মানুষটার সঙ্গে তোমার তিরিশ বছর সাক্ষাৎ নেই, তোমাদের দুজনের যেখানে ভবিষ্যতেও পরস্পরের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কম—সেখানে এরকম একটা সম্পর্ক জীইয়ে রাখা পাগলামি নয়! এই সব স্পিরিচুয়াল লাভের ন্যাকামি সহ্য করা যায়?'

'আমার মত যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলব—ভালবাসা বেঁচে থাকাই ভাল।'

জুলি একবার ভাবল সুভদ্রকে বেশ ভাল করে শুনিয়ে দেয় দু-চারটে কথা। পর মুহূর্তে ভাবল—কী লাভ! ওরা এখনো জগতের কতগুলো বানানো সত্যিতে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে একজন পুরুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় কিংবা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, পুরুষমাত্রই কি পরিমাণে স্বার্থপর হয়। জুলির মজ্জায় মজ্জায় এই বিশ্বাস আছে—একজন পুরুষ একজন নারীকে ঠিক ততটুকু সময়ই ভালবাসে যতটুকু সময় সে সেই নারীদেহ উপভোগ করে। অন্য সময়গুলোতে পুরুষ নারীকে ভালবাসার ভান করে মাত্র। আর ঠিক এই জন্যেই মেয়েদেরও উচিত

এর পাল্টা মানসিকতা তৈরি করা। দেহসুখের উপকরণ হওয়া ছাড়া একজন নারীর জীবনে একজন পুরুষের আর কোনো ভূমিকা আছে বলে মনে করা উচিত নয়।

জুলি সুভদ্রর কথায় কোনো প্রতিবাদ না করে হালকা হাসির মত করে বলল,'তোমার ভালবাসা বেঁচে থাকুক চিরকাল।'

বব যে তার হ্যাভারস্যাকে কয়েকটি বীয়ারের ক্যান ভরে এনেছিল এত সময় তা কেউ টের পায়নি এখন জুলির কথার সঙ্গে সঙ্গে সেও 'লঙ, লিভ য়ুয়োর লভ' ধ্বনি তুলে ক্যানের মুখ খুলে দিয়ে জুলির দিকে একটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'চালিয়ে যাও, ডার্লিং, চালিয়ে যাও।' তারপর একটা একটা করে বীয়ার-ক্যান সে এগিয়ে দেয় সকলের দিকে। তারপর গলায় বীয়ার ঢালতে ঢালতে সে আপনমনে গান গায় খানিকটা।

রাত অনেকটা এগিয়ে গেছে। শেষরাত পর্যন্ত থাকবে ব্ল্যাকপুলের এই আলোর সাজ, দর্শনার্থীর ভিড়। সমুদ্রের ধার দিয়ে সারারাত চলাচল করবে ট্রলিবাস। দোতালা ট্রলিবাস। তাতেও মানুষ ঠাসা। ট্রলিবাসের গায়েও সাজানো হয়েছে রঙবেরঙের আলো।

আরো কিছুটা সময় সমুদ্রের পাড়ে বসে ওরা উঠে পড়ল যখন, জুলি আবার সুভদ্রকে বলল গলা নামিয়ে, 'জীবনে একবার মিথ্যের পেছনে ছুটে মা তার জীবনে দুঃখ ডেকে এনেছিল। আর জীবনের আর এক প্রান্তে এসে মা আবার আর একটা মিথ্যে--আর একটা স্বপ্ন গড়তে শুরু করেছে।'

'কিসের স্বপ্ন ?'

'ভারতবর্ষের বার্ধক্যের প্রশান্তি। মার এখন স্থির বিশ্বাস, জগতে মানুষের শেষ বয়সের শান্তি যদি কোথাও থেকে থাকে তো সে প্রাচ্যে, তোমাদের দেশেই আছে। হাজারো অভাব, অসহায়তা এবং অব্যবস্থার মধ্যেও তোমাদের দেশে মানুষের শেষ বয়সে যে প্রশান্তি দেখা দেয়, ছেলেমেয়েদের সংসারে নাতিনাতনি নিয়ে আর ভগবানকে, নিয়ে তারা যে নির্মল জীবনযাপন করে তার নাকি তুলনা নেই।'

জুলির পাশাপাশি কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর সুভদ্র বলল, 'উনি যদি ওর মধ্যে এই ভাবনাটা নিয়ে থাকতে চান, ক্ষতি কি ? যদিও আজকের ভারতবর্ষে সর্বত্র আর বার্ধক্যের ওই ছবিটা নেই। তোমাদের জীবনের প্রভাবই যে শুধু আমাদের সমাজের একাংশের ওপর পড়েছে তা নয়, আমাদের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থাতেও তো নিজের থেকেই বদল হয়েছে অনেকখানি। অবশ্য তোমাদের দেশে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও যেমন দেখছি রঙচঙ মেখে যৌবনের প্রতিযোগী হওয়ার চেষ্টা উৎকট রকমের তীব্র—ওখানে এতটা হয়নি। বার্ধক্যের একটা নিজস্ব রূপ আছে এবং সে রূপে আমাদের ভাললাগার অভ্যেস হাজার হাজার বছর ধরে।'

জুলি হঠাৎ হেসে ওঠে ; তারপর প্রশ্ন করে, 'তুমি কি তোমার কলেজের ক্লাসে এইভাবে লেকচার দাও ?' আবার খানিকটা হেসে জানতে চায়, 'তুমি কি চাইছ, মাকে এই বয়সে তোমার বাবার কাছে পাঠাব, তোমার বাবা তো কিছুতেই ওই বার্ধক্যের প্রশান্তি ছেড়ে আসতে চাইবেন না।'

'তা কেন ? তোমার মাকে এখানেই থাকতে দাও না তাঁর স্বপ্নের জগৎটা নিয়ে। বৃদ্ধাবাসে না পাঠিয়ে যতদিন পার রাখ তোমার নিজের কাছে।'

জুলি কোনো উত্তর করল না। শুধু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সাবিনা আর গুরতেজ এগিয়ে এসে তাদের পাশাপাশি হাঁটছে। বব আর ক্রিস্টেলাও এসে পড়ল ওদের কাছে। বব ঘুরে গিয়ে তার শেষ বীয়ার-ক্যানটা ক্রিকেট বল ছোঁড়ার ভঙ্গিতে সমুদ্রের দিকে ছুঁড়ে মারল। তারপর সুভদ্রকে প্রায় ধমক দেওয়ার মত করে বলল, 'তখন থেকে প্রেম নিয়ে কি দার্শনিক কচকচি করছ দুজনে ? ওই সময়টুকু তো চুটিয়ে প্রেম করলে পারতে !'

আট

এবার ফেরার পালা।

ফেরার পথে ছোট্ট শহর প্রেসটোতে থামল ওদের গাড়িগুলো। কিছু ভাল হোটেল আছে এখানে। ব্ল্যাকপুলের বহু যাত্রীই রাতের খাওয়া সেরে নেয় এখানে। ফেরার পথেও নামে অনেকে। সারারাত কমবেশি সব হোটেলই প্রায় জমজমাট।

হোটেলের নাম 'কিসমৎ' দেখে গুরতেজ ঠিক করল, ওখানেই খাবে। রাস্তায় গাড়ি পার্ক করে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠল সকলে। বেশ ভিড়। একসঙ্গে সকলে বসতে গেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছাড়াছাড়াই বসতে হল।

জুলির পাশে বসার জায়গা করে নিয়েছিল সুভদ্র। বড় ঘরের একটা কোণ। বেশ একটা মায়াময় পরিবেশ গড়ে উঠেছে সবুজ আলোয়। রবিশঙ্করের সেতার বাজছে। সতের আঠার বছরের ওয়েটার ছেলেটিকে সুভদ্র প্রশ্ন করল, 'এ হোটেলের মালিক কি ভারতীয় ?'

সুভদ্রর ইংরেজি প্রশ্নের জবাবে ছেলেটি ঈষৎ সিলেটি টান মেশানো বাংলায় বলল, 'আপনি কি বাঙালী ? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।'

সুভদ্র রীতিমত অবাক। ছেলেটির সাহেবি চামড়া, কটা চোখ, মুখের আদলে কোথাও বাঙালী ছাপ নেই। সুভদ্রকে বিস্মিত হতে দেখে ছেলেটি বলে, 'হোটেলের মালিক বাঙালী। আমার বাবা উনি। এ হোটেলের ঝাড়ুদার থেকে মালিক--সবাই আমাদের ফ্যামিলির লোক। আমার মা স্কচ।'

সুভদ্র বলে বাংলাতেই, 'লণ্ডন থেকে এত দূরে এই রকম ছোট্ট একটা শহরে বাঙালীর হোটেল দেখব ভাবতেই পারিনি।'

'এখানে আরো বাঙালী পরিবার আছে। ইণ্ডিয়ার লোকজনও অনেক। আর সেইজন্যে—'বলে থেমে গেল ছেলেটি।

'সেজন্যে কি ?'

'না। মানে সেজন্যে ইণ্ডিয়া বা বাংলাদেশের মানুষজন আমাদের হোটেলগুলোতেই বেশি আসে।' সুভদ্র পরিষ্কার বুঝতে পারল ছেলেটি কথা ঘুরিয়ে নিল। কি বলতে চাইছিল ও ?

ছেলেটি খাবার নামিয়ে চলে যাওয়ার পর জুলি বলল, 'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার পর তুমি শুধু আমার সম্পর্কেই শুনেছ, জেনেছ।'

'ঠিক। কেননা তোমার সম্পর্কে আমার কৌতূহল প্রথম থেকেই। আর একথাও ঠিক, আমার সম্পর্কে তোমার কোনো কৌতূহল নেই।'

'শুধু তোমার বলে নয়। আমার অন্যান্য বন্ধুদের সম্পর্কেও আমার কোনো কৌতূহল নেই।'

'কেন ?'

'ওটাই আমার প্রকৃতি। তবে এই মুহূর্তে তোমার কথা জানতে খারাপ লাগবে না।'

'সেটা শুধু আমার প্রশ্ন এড়ানোর জন্যে।'

'তাই যদি হয় !'

সুভদ্র জুলির চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছেলেদের যে তাকানোটা তাদের অনেকটা ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট করে তোলে জুলির কাছে এ তাকানো তেমন নয়। তবু এই চেয়ে থাকা অস্বস্তিতে ফেলে জুলিকে। সুভদ্রের প্রতি রূঢ় হতে তার কোথায় যেন আটকায়। অস্বস্তিটা এড়ানোর জন্যেই সে বলে, 'শুনি, তোমার বান্ধবীদের কথা। প্রেমট্রেম ইত্যাদি।'

সুভদ্র হেসে বলল, 'আমার একজন বান্ধবীর গল্প তোমায় বলতে পারি।'

'বল।'

'জীবন থেকে সে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে। তবু আমি তার কাছে ঋণী।'

'কেন ?'

[illegible] মধ্যে ভালবাসা জাগিয়েছে বলে।'

জুলি এক মুহূর্ত সুভদ্রর দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখল। তারপর চোখ সরিয়ে সরে চলল নিঃশব্দে। সেই মুহূর্তে সুভদ্রর মুখের ওপর কোনো কঠোর কথা বলতে কেন যেন দ্বিধা হল তার। রবিশঙ্করের সেতার থেকে এখনো সুর ঝরছে।

সব কথা সবাইকে বলা যায় না। কিছু কথা আছে যাকে শুধু মনের তলাতেই রাখতে হয়, যা একান্ত সত্য হলেও অতি প্রিয়জনের কাছেও বলতে নেই। অথচ সেকথা বলে ফেলেই জুলি একসময় নিজের দুঃখকে ডেকে এনেছে। প্রিয়পুরুষকে নিজের যন্ত্রণার দুঃখ ভাগ দিতে গিয়ে বুঝেছে পুরুষ শুধু দেহসুখের আত্মতৃপ্তিতেই ভালবাসার ওজন করে। লরেন্সকে সে যদি জোজোর কথা না বলত, তবে তার জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যেত।

জোজো লোকটা ছিল বদমাস, ঠগ। তবু কেন লোকটা নেশার অভ্যেসের মত টানত জুলিকে! জেনেশুনে, জুলি নেশার টানের মতই তাকে দরজা খুলে দিয়েছিল!

উইলেসডেনগ্রীনের বাড়িটা তখনো কেনা হয়নি। নিচের একতলাটা ভাড়া নিয়ে ডেন্টাল হসপিটাল শুরু করেছিলেন বাবা। সকালবেলা বাবা-মা দুজনেই চলে আসতেন হসপিটালে তাঁদের ফিন্সলের ফ্ল্যাটবাড়িটা থেকে।

জুলির তখন হাইস্কুলের শেষ বছর। ছুটি চলছে। মা বাবা সকালে বেরিয়ে গেছেন যথারীতি। দুপুরবেলা তাদের ফ্ল্যাটে জুলি একা পড়াশোনা করছিল।

দরজার বেলটা বেজে উঠল। একবার, দুবার।

ডানদিকের জানলার কাচের মধ্য থেকে জুলি দেখল মাঝবয়েসী একটা লোক। হাতে অ্যাটাচি। কাচের পাল্লা খুলে প্রশ্ন করতে লোকটি জুলিকে একটা কার্ড দেখিয়ে বলল যে সে টি ভি কোম্পানি থেকে আসছে। বাড়ি এবং ফ্ল্যাট নম্বর, বাবার নাম, কবে কমপ্লেন করা হয়েছিল—সব বলে গেল লোকটা কার্ডের দিকে তাকিয়ে।

জুলি দরজা খুলে দিয়েছিল। লোকটাকে নিয়ে গিয়েছিল ভেতরের ঘরে যেখানে টি ভি সেটটা ছিল। লোকটা নিঃশব্দে টি ভি সেট সারাতে শুরু করেছিল। সারাতে সারাতেই লোকটা বারদুয়েক জুলির বুকের দিকে তাকিয়েছিল। জুলি তখন বেশ কিছুকাল হল পুরুষের ওই তাকানোটা চিনতে শুরু করেছে।

জুলি পাশের ঘরে চলে এসেছিল। কিছুক্ষণ পরে টি ভি সেট সারানোর পর লোকটা পাশের ঘরের দরজার সামনে এসে জুলিকে বলল তার কার্ডে সই করে দেওয়ার জন্যে। জুলির মাথা যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল অল্প আগে।

জুলি কলম আনতে যাচ্ছিল, লোকটা তাকে জানাল, তার কাছে কলম আছে। বলে হাত বাড়িয়ে কলমটা দিয়েছিল। জুলি হাত বাড়িয়ে কলম নিয়ে সই করে দিল লোকটার কার্ডে। তারপর লোকটার কলম আর কার্ড ফেরত দিল।

লোকটা ক্রমাগত মুচকে মুচকে হাসছিল। জুলিকে দেখছিল। জুলি বুঝতে পারছিল লোকটা কি ভাবছে।

জুলি অপেক্ষা করছিল লোকটা কখন চলে যাবে এবং সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার পড়তে বসবে। অথচ লোকটার কোনো যাওয়ার তাড়া নেই।

খুব রহস্য করে হাসতে হাসতে লোকটা বলল, 'আমার নাম জোজো। আমি সব রকমের ইলেকট্রিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের কাজ জানি। তোমার কিছু সারানোর থাকলে আমাকে দিয়ে সারিয়ে নিতে পার এখন।'

না, তেমন কিছুই নেই সারানোর।' জুলি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে চাইছিল। আরে! লোকটা নড়ে না দেখি। জুলি চোখেমুখে বিরক্তি প্রকাশ করল।



লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'বাথরুমটা কোনদিকে

মুখে বিরক্তি নিয়েই জুলি বাথরুমটা কোনদিকে দেখিয়ে দিয়েছিল। লোকটা বাথরুম সেরে এসে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, 'তুমি খুকি আমাকে দেখে খুব ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে

খুকি বলাতে চটে গিয়েছিল জুলি। বলেছিল, 'ভয় পাওয়ার কি আছে! আমার খুব মাথা যন্ত্রণা করছে। আপনি আসতে পারেন।'

'মাথা যন্ত্রণা আমি এক মিনিটে সারিয়ে দিতে পারি। তুমি যদি ভীতু না হও, পরখ করে দেখ একবার। ঘাড় ধরে দেখ। এক মিনিটে তোমার মাথা যন্ত্রণা না সারে তো আমায় গালাগাল দিও।' বলতে বলতে জোজো এগিয়ে আসছিল।

'না, না, ঠিক আছে। কোনো দরকার হবে না আমার।'

'আরে ভীতু মেয়ে। অসুখ-বিসুখের ব্যাপারে কখনো লজ্জা করতে আছে নাকি বোসো. বোসো না তুমি এই সোফায়। ঘাড় ধরে এক মিনিট।'

বশীকরণ বিদ্যে না কি যে বলে যেন. জোজোর তাকানোর মধ্যে কি যেন একটা ছিল। সেই তাকানোর বিরুদ্ধে নিজের ভেতরকার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও জুলি আর না বলতে পারল না।

জোজো সোফার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। জুলির মাথার পেছন থেকে জুলির কপালে দুহাত দিয়ে চমৎকার কায়দায় টিপতে শুরু করে দিয়েছিল।

না, এক মিনিটে সারেনি তার মাথার যন্ত্রণা। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই কেমন যেন আরামের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল জোজো।

পাঁচ মিনিট···দশ মিনিট···এইভাবে সময় পেরোতে পেরোতে কেমন যেন তন্দ্রা এসে যাচ্ছিল তার। সেই আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যেই জুলি এক সময় টের পেয়েছিল জোজোর দুটো হাত তার স্তনের ওপর নেমে এসেছে। আর সেই ঘোরের মধ্যেই জুলি বুঝতে পারল জোজো জুলির পোশাক সরিয়ে ফেলছে তবু জুলির গলা দিয়ে অস্ফুট একটা শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরোচ্ছে না। জুলি অনুভব করছিল সেই সোফার মধ্যেই জোজোর শরীর গরম নিঃশ্বাসের দমকে দমকে তার শরীরের মধ্যে নেমে আসছে ক্রমশ।

সেই শুরু। তারপর টানা তিন বছর জোজো নামের সেই মধ্যবয়েসী লোকটা এসেছে তাদের ফ্ল্যাটে ওইরকম বিভিন্ন ছুটির দুপুরে। লোকটা দেখতে একেবারে সাধারণ। সামান্য পড়াশোনা করেছে। তার সংসার আছে। দুটো বাচ্চা। মেয়ের বয়স দশ, ছেলের বয়স সাত।

তিন বছর পর লোকটা যে কোথায় গেল—তার আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। জুলি শুধু জানতে পেরেছিল ওই টি ভি কোম্পানি থেকে জোজোর চাকরি গেছে। কি কারণে গেছে সেটা অবশ্য সে জানতে পারেনি। জানার চেষ্টাও করেনি। কিছুদিন পরে চেরিংক্রস টিউব স্টেশনে একটা লোককে জোজোর মত মনে হয়েছিল চকিতে। তারপর লোকটা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল।

জোজোর ঘটনা যেমন এ মুহূর্তে তার মধ্যে জীবনের প্রতি একটা

ক্ষোভ ছাড়া আর কিছু গড়ে না, তেমনি লরেন্সের সরে যাওয়াও তাকে যেন জীবনের দিকে থেকে জোর করে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে।

খবরের কাগজে চাকরি পাওয়ার আগে জুলি কিছুদিন কাজ করেছে একটা প্রাইভেট ফার্মে। সেইখানে লরেন্স ছিল তার সহকর্মী। বন্ধুত্ব হওয়ার পর তারা দুজনে কয়েকবার সমুদ্র সৈকতে উইক এণ্ড কাটিয়ে এসেছে। প্রতিবারেই সহবাসের মুহূর্তগুলোতে লরেন্সের প্রচুর আদর এবং উষ্ণ শিহরণের মাঝখানেও কেমন যেন একটা অভাববোধ-জুলির ভেতরে ভেতরে বেজেছে।

জুলির এই অভাববোধের বিষণ্ণতা লরেন্সের চোখ এড়িয়ে যায়নি। সে বার বার প্রশ্ন করেছে, জানতে চেয়েছে জুলির বিষণ্ণতার কারণ কি! পরে এক সময় জুলিরও মনে হয়েছে সবচেয়ে কাছের মানুষের কাছে এত লুকোছাপার কোনো মানে হয় না। জুলি পরের এক সহবাসের রাতে লরেন্সকে সবকিছু জানিয়েছে কোথাও কিছু আড়াল না রেখে।

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও, পরে একটু একটু করে লরেন্স সরে গেছে তার কাছ থেকে। পরে বুঝেছে জুলি পুরুষের কোথায় অহঙ্কারে ঘা লাগে সবচেয়ে বেশি। যাকে সে উপভোগ করে তার তৃপ্তির ষোল আনাও তার উপভোগ করা চাই। আর এটার ভিত্তিতেই পুরুষের ভালবাসা।

হ'ত পারে সুভদ্র হয়ত লরেন্সের মত পুরুষ না, জোজোর মত তো নয়ই ...বু সব পুরুষই এক জায়গাতে এক। তার আত্মসুখকে সে ভালবাসার আচ্ছাদন দিয়ে রাখে।

নয়

হোটেল থেকে নিচে নেমে এসে আবার দু দলে ভাগ হয়ে ওরা যখন একে একে দুটো গাড়িতে উঠছে, ছোট্ট শহরটাকে হঠাৎ যেন খুব থমথমে মনে হল।

ঘণ্টা দেড়েক আগে, গাড়ি পার্ক করে ওরা যখন খেতে গিয়েছিল তখন একেবারে অন্যরকম, গভীর রাতকে সবে সন্ধে বলে মনে হয়েছিল চারপাশের লোকজন আর আলোর ভিড়ে। দেড় ঘণ্টার মধ্যে একেবারে বদলে গেছে। রাস্তার দুপাশের দোকানপাট সব বন্ধ। গাড়ি, লোকজন কিছুই নেই। সবাই উঠে বসেছে গাড়িতে। শুধু ক্রিস্টেলা আর জুলি ওঠেনি এখনো। ওরা নামছে সবার শেষে। ক্রিস্টেলাও এসে গেল। রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল যখন, জুলিকে দেখা গেল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে।

সুভদ্রর মনে পড়ে গেল হোটেলের মালিকের ছেলেটির কথা। কি একটা বলতে গিয়ে ছেলেটি কথা ঘুরিয়ে নিয়েছিল। ও কি বিপদের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল?

সুভদ্র চেঁচিয়ে ডাকল, 'জুলি, দৌড়ে এস।'

কিন্তু তার আগেই পাশের রাস্তাটা থেকে হৈ হৈ করে এক দঙ্গল মারমুখী লোক ছুটে এসে ঘিরে ধরেছে জুলিকে। বাকি কিছু লোক চিৎকার করে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি দুটোর দিকে। ওরা সব কালো চামড়ার লোক। চিৎকার করে বলছে, গাড়ি দুটোতে আগুন ধরিয়ে দাও। আমরা দুজন কালো চামড়া খুনের বদলা নেব দশজন সাদা চামড়া খুন করে।'

পালাবার জন্যে দুটো গাড়িই স্টার্ট নিয়েছে। সুভদ্র লাফ দিয়ে নেমে গেল গাড়ি থেকে। গাড়ির ভেতর থেকে সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে বলল, 'বোকামি করো না, ওরা আমাদের পিষে মারবে।'

ততক্ষণে দু চারটে পাথরের টুকরো এসে পড়েছে গাড়ি দুটোর ওপর এবং দুটো গাড়িই ছুটে বেরিয়ে যেতে শুরু করেছে ওদের নাগালের বাইরে। গাড়ির কাচ ভেঙেছে, পাথরের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে গাড়ির বডি।

দুজন শিখ ছেলে জুলিকে পাঁজাকোলে করে তুলে নিচ্ছে দেখে সুভদ্র হিন্দিতে চিৎকার করে ওঠে, 'ওকে ছেড়ে দাও, ও আমাদের বন্ধু। ওর বাবা ইণ্ডিয়ান।'

উল্টোদিক থেকে কয়েকজন গালাগাল দিয়ে উঠল সুভদ্রকে হিন্দিতেই, 'শালা মহব্বত দেখাচ্ছে। সাদা চামড়ার কুত্তাগুলো খতম করছে আমাদের আর তুমি শালা তাদের হয়ে ওকালতি করতে এসেছো!'

জুলি 'হেল্প, হেল্প' করে আর্তনাদ করে ওঠায় সুভদ্র আর আগে পরে ভাবার অবকাশ পায় না, ছুটে গিয়ে ছাড়াতে চায় জুলিকে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চড়াও হয় সুভদ্রর ওপর, 'মারো শালাকো' 'শালা দালাল এক নম্বর' ইত্যাদি হুঙ্কার সমেত পরপর অনেকগুলো ঘুঁষি এসে পড়ে সুভদ্রর মাথায়। ওদিকে জুলির ওপর একজন ঝাঁপিয়ে পড়ায়, জুলি জোরে কামড়ে দেয় তাকে। আহত হয়ে আরও যেন খেপে যায় লোকটা। জুলির পোশাক ছিঁড়ে দেয় ফালা ফালা করে। ততক্ষণে আরও কজন এসে লাফিয়ে পড়ছে জুলির ওপর।

মাথা এবং চোয়াল বেয়ে রক্ত ঝরছে সুভদ্রর, মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তিটুকুও যেন নেই তার, টলে যায়। তবু মরিয়া হয়ে সে জাপটে ধরে জুলির ওপর চড়াও হওয়া যুবকটিকে। মুহূর্তের মধ্যে ছোরা বেরিয়ে আসে কয়েকজনের কোমর থেকে।

আর সেই মুহূর্তেই মাথায় লাল আলো জ্বালিয়ে-নিবিয়ে-সাইরেন বাজিয়ে একসঙ্গে পাঁচ-ছখানা পুলিশী ওয়াগন ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসে বিভিন্ন দিক থেকে। ডানহাতের ওপরদিকে ছোরা খেয়ে সুভদ্র তখন বসে পড়েছে রাস্তার ওপরে।

কিছু পালায়, কিছু ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। আর দেখতে দেখতে ভেরদিয়ে ক্রিস্টেলা ইত্যাদি বাকি সকলকে নিয়ে গাড়ি দুটো চলে আসে। ওরাই টহলদার পুলিশ অফিসারকে জানিয়েছে এইখানকার গণ্ডগোলের কথা। আর একমুহূর্তও দেরি না করে সুভদ্রকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অনবরত রক্ত বেরোনোর ফলে একসময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে সে।

পরের দিন সকালে সুভদ্র যখন চোখ মেলে তাকায়, প্রথমে বুঝতে পারে না কোথায় শুয়ে আছে সে। শুধু চোখের পাতা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় জুলি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তার দুটো নীল চোখ নিয়ে।

সুভদ্রকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় না। জুলিই তাকে বলে সব। সে এখন বার্মিংহাম হাসপাতালের কেবিনে। ডাক্তার বন্ধুরা তো আছেই, আছে অন্যরাও। জুলি বাড়িতে ফোন করে দিয়েছে। গণ্ডগোলের কথা বলেনি। বলেছে ডাক্তারবন্ধুরা আটকে দিয়েছে, চিন্তার কোনো কারণ নেই।

সুভদ্র কোনো কথা বলে না, জুলির নীল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওই চোখ দুটোকে এর আগে কখনো এতো গভীর মনে হয়নি।

কেবিনের জানলা এখন খোলা। আজ ঝকঝকে রোদ উঠেছে। জানলা দিয়ে দেখা যায় আকাশের অনেকখানি নীল।

'আমি ভাবতে পারিনি, তুমি ওইরকম করবে।'

'আমিও ভাবতে পারিনি, আমি ওইরকম করব।' বলে জুলির দিকে তাকিয়েই ভাবে সুভদ্র।

'খুব বোকামি করেছ।'

'মানলাম।' বলে হাসে সুভদ্র। একটু থেমে বলে, 'বলেছিই তো তোমাকে, আমার ঋণ আছে।'

জুলি আরো একটু মুখ নামিয়ে বলে, 'তোমার ঋণ তো শোধ করে দিলে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'আমার ঋণ?'

সুভদ্র জুলির নীল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চমকে ওঠে। বলে, 'কি কাণ্ড! তোমার চোখেও জল আসে তাহলে?'

সমাপ্ত

ছবি : বি সাহা

শরীর ও স্বাস্থ্য ঃ ব্যায়াম

রেবা রক্ষিত

Leg Crossing (লেগ ক্রসিং)

প্রথমে মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। এবার শরীরের দু পাশ দিয়ে দু হাত সোজা অবস্থায় তুলে মাথার উপরে মেঝেতে রাখুন। এবার কনুই থেকে হাত দুটো ভাঁজ করে বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে ডান হাতের আঙুল ঢুকিয়ে দিন। এবার মেঝে থেকে আট ইঞ্চি উপরে মাথা তুলুন এবং মাথার পেছনে অর্থাৎ ঘাড়ের একটু উপরে হাতের চেটো দুটো চেপে রাখুন। এবার মেঝে থেকে পা দুটো সোজা এবং জোড়া অবস্থায় ছ'ইঞ্চির মত তুলে রাখুন। এবার প্রথমে ডান পা দু'ফুটের মত তুলুন এবং সংগে সংগে নামিয়ে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনুন – অর্থাৎ মাটি থেকে ছ'ইঞ্চি উপরে রাখুন। এবার সংগে সংগেই বাঁ পা দু'ফুটের মত তুলুন এবং নামিয়ে দিন। এভাবে খুব তাড়াতাড়ি ডান এবং বাঁ পা তুলতে ও নামাতে হবে। এ সময় কিন্তু মেঝেতে পা ঠেকবে না। এভাবে খুব তাড়াতাড়ি দু'পা ওঠানামা করতে হবে। এভাবে দু পা মিলে ওঠানামা প্রায় একশ বার করতে হবে। এ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, পা যেন সোজা থাকে। প্রথম অবস্থায় হয়ত অনেকের পক্ষে এ ব্যায়ামটি একশ বার করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে তাঁরা প্রথমে কুড়ি বার করে আরম্ভ করবেন। তারপরে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে একশ বার করতে সক্ষম হবেন। এ ব্যায়ামটি দু'পা মিলে একশ বার হিসেবে তিন খেপ করতে হয়।

লেগ ক্রসিং



এ ব্যায়ামটি অনেকেই প্রথম অবস্থায় ঘাড়ের পেছনে হাত রেখে ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাঁরা হাত দুটো ঘাড়ের পেছনে রাখার পরিবর্তে হাত দুটো সোজা অবস্থায় হিপ-এর তলায় দিয়ে অভ্যাস করবেন। এ সময় হাতের চেটো দুটো মেঝের দিকে থাকবে। এভাবে কিছুদিন অভ্যাস করার পর ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেভাবে করতে সক্ষম হবেন।

এ ব্যায়ামটি নিয়মিত অভ্যাস করলে চর্বিতে যাঁদের পেট ঝুলে পড়েছে সেই ঝোলাভাব দূর হবে। তাছাড়া পেট, তলপেট ও উরুতের চর্বিও কমবে।

ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

একশো বছর আগে যাত্রায় মেয়েদের ভূমিকা

এখন যাত্রা নিয়ে মাতামাতির অন্ত নেই।

যাত্রা কোম্পানীর মালিকরা কথায় কথায় বলে থাকেন, গ্রামগঞ্জের অতি সাধারণ মানুষদের জন্য তাঁদের এই যাত্রা-ব্যবসা। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। ষাটের দশক থেকে এই যাত্রা যে শহরের দর্শকদের মন অনেকটাই জয় করেছে তা অনায়াসেই বলা যায়।

এখন কলকাতার পার্ক বা খোলা মাঠে যাত্রার জমজমাট উৎসব হামেশাই হচ্ছে। যাত্রা একটু একটু করে গ্রাস করছে পাবলিক স্টেজগুলো। এই প্রসঙ্গে মহাজাতি সদন, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, শীতাতপ স্টার, রঙমহল, বিশ্বরূপা ইত্যাদি রঙ্গশালার কথা নতুন করে বলার নয়। এমনকি অভিজাত বলে খ্যাত রবীন্দ্রসদন, কলামন্দির বা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ছাড়াও মাঝে মধ্যে সেনেট হলের পাদপ্রদীপও যাত্রা-বিহীন নয়।

এক কথায়, যে-যাত্রা একদা তথাকথিত শহরকেন্দ্রিক অভিজাত মহলের কাছে 'যাত্রা দেখে ফাত্রা লোকে' বলে বিবেচিত হত, এখন সেই মহলের একটা বড় অংশ চিত্তবিনোদনের জন্যে গাড়ির পর গাড়ির মিছিল বসিয়ে যাত্রা দেখছেন। আমরা মোটামুটিভাবে একটা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, এই অভিজাত মহলের মহিলাদেরই যাত্রা-প্রীতি পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি।

যাত্রা মেয়েদের মন ভুলিয়েছে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। মেয়েরাই বরাবর যাত্রার সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। তার অনেক কারণও রয়েছে। সে আলোচনায় যাব না। একটা কথাই বলব, এতকাল ধরে যাত্রা এমন জনপ্রিয় হলেও এর ব্যবসাগত বা পরিচালনার ব্যাপারে মেয়েরা কিন্তু দূরে থেকেছেন। এর কারণ সঠিকভাবে দেখানো না গেলেও বোঝা যায়, যাত্রার মালিকরা তাদের বউ-মেয়েকে এই ব্যবসা বিষয়ে কোন ভাবেই অভিজ্ঞ বা সচেতন করে তুলতে চাননি। বোধকরি পারিবারিক কৌলীন্য হারাবার ভয়েই তাঁদের সামাজিক দিকটার কথা মনে রেখেই ফলত ষাটের দশকের পর বেশ কয়েকটি দল উপযুক্ত উত্তরাধিকারের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে।

উত্তরাধিকার সূত্রে যদিও অনেক বিধবা মহিলা তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পরিচালন দায়-দায়িত্ব পেয়েছিলেন, কিন্তু কোনো-না-কোনো অক্ষমতায় পরবর্তী সময়ে তারা সেই প্রতিষ্ঠান লিজ দিয়েছেন।

সম্প্রতি এর ব্যতিক্রম একটিমাত্র ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সেটি হল সত্যাম্বর অপেরা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাত্রা মালিক শৈলেন মহান্ত আকস্মিকভাবে মারা গেলে এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ও কর্মভার গ্রহণ করেছেন কন্যা রেবা মহান্ত। বলা বাহুল্য শৈলেনবাবু ছিলেন পুত্রহীন।

এই যে সাহস, এই যে সাংগঠনিক ক্ষমতা এ যুগে যেমন বিরল তেমনি যে-যুগে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে মেয়েদের যাত্রা দেখাটা ঘোরতর অপরাধ ছিল, সেই যুগে এ দেশেরই এমন কয়েকজন মহিলার সন্ধান পাওয়া যায় পুরাতন যাত্রার ইতিহাসের পাতায়, যাঁরা স্বামীর অবর্তমানে শুধু প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্ত্রী হয়েছিলেন তাই নয়, পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে আদর্শস্থানীয়া হয়েছিলেন। এমনি একজনের কথা আজ বলি। যিনি বউ কুণ্ডু নামে পরিচিতা ছিলেন।

বউ কুণ্ডুর কথা বলতে গেলে মতিলালের কথা একটু বলা দরকার।

মতিলাল রায়। মতিলাল রায় হলেন আজকের আধুনিক যাত্রার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক বা যাত্রার সংস্কারক। রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি প্রায় সব শাস্ত্রে মতিলালের ছিল পাণ্ডিত্য। মতিলাল শুধু পালাকার বা দল-পরিচালক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। মতিলাল যখন পায়চারি করতে করতে আপন মনে কবিতা বা গানের পদ বলে যেতেন তখন দুজন লোক সেই কবিতা বা গান লিখে রাখতেন।

মতিলালের জীবনটা অনেক বড়, সেই বড় মাপের গল্পটা রেখে আসল গল্পে ফিরে যাই। মতি রায় অনেক পরিশ্রম দিয়ে একটা যাত্রা দল তৈরি করেছিলেন। সেই দল বহুবার ভেঙে গিয়েছিল আবার বহুবারই তিনি সেই দল গড়েছিলেন। একবার মতি রায়ের সেই দলকে ভেঙে দিয়েছিলেন বউ কুণ্ডু।

বউ কুণ্ডুর আসল নাম ছিল মুক্তামণি দাসী। মুক্তামণির যত দাপট তা অবশ্য এসেছিল তার কুণ্ডু বাড়ির বউ হয়ে আসবার পর থেকে। নবদ্বীপের প্রখ্যাত তিলি ব্যবসায়ী ছিলেন জয়মণি কুণ্ডু। এই জয়মণিবাবুর ছিল দুই ছেলে। একজন হলেন নীলমণি কুণ্ডু অপরজন রত্নমণি কুণ্ডু। এই নীলমণির স্ত্রী হলেন মুক্তামণি ওরফে বউ কুণ্ডু।

নীলমণির সঙ্গে রত্নমণির সম্পর্ক বিন্দুমাত্র মধুর ছিল না। বরং একটা বড় ধরনের রেষারেষি ছিল দুই ভায়ের মধ্যে। নবদ্বীপের এই প্রসিদ্ধ কুণ্ডু বাড়িতে রাসের সময় রীতিমত বর্ণাঢ্য উৎসব বসত। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল যাত্রা গান। যে বছর রত্নমণি কুণ্ডুর ওপর রাসের পালা পড়ত তার পরের বছরে পালা থাকত নীলমণি কুণ্ডুর। রত্নমণি চুটিয়ে যাত্রা গানের আসর বসাতেন মতিলাল রায়ের প্ররোচনায়। এর কারণ, এই মতিলাল রায়ের পৃষ্ঠপোষক ও প্রিয়জন ছিলেন রত্নমণি। সুতরাং রাসের উৎসব নীলমণির চাইতে রত্নমণি একটু বেশি মাত্রায় জাঁকজমকের সঙ্গে করতেন।

এই প্রতিযোগিতা বাইরের লোকদের কাছে যতই প্রিয় হোক মুক্তামণি কিন্তু এতে প্রচণ্ড অপমান বোধ করতেন। অপমান বোধ করতেন স্বামী নীলমণিকে সবাই মিলে হারাতে চাইছে বলে।

একদিন নীলমণি কুণ্ডু হঠাৎ মারা গেলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের ক্রমাগত দুর্ব্যবহারের জন্যে মুক্তামণি দাসীর মনে প্রবল বিদ্বেষ দেখা দিল। স্বামীর মৃত্যুর পর যখন রাসের পালা তাদের ওপর ন্যস্ত হল, তখন মুক্তামণি মতিলাল রায়কে অনুরোধ জানালেন রাসে যাত্রা গান করার। কিন্তু মতি রায় সেই অনুরোধ রাখেননি। এর মূলে অবশ্যই রত্নকুণ্ডু। এই অপমানের পরেই মুক্তামণির মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য জামাই রজনীকান্তের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং নিজে দল তৈরি করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন। ১২৮৪ সনে তিনি দল তৈরিও করেন।

এরপর একদিন ডাকসাইটে মতিলাল রায় সদলবলে চারখানা নৌকা নিয়ে যাচ্ছিলেন শান্তিপুরের বড় গোস্বামী পাড়ায় যাত্রার পরিভাষায় গাওনা করতে। মুক্তামণি সেই সুযোগের অপব্যবহার করলেন না। তিনিও প্রভূত অর্থ ব্যয় করে লোক পাঠালেন নৌকা যোগে, বলে দিলেন—যেমন করেই হোক যত টাকাই লাগুক মতি রায়ের নৌকা থেকে মাঝপথে সেই টাকার লোভ দেখিয়ে বাছাই বাছাই অভিনেতা এবং যন্ত্রীদের ভাঙিয়ে আনতে হবে। তাই হল। মুক্তামণি দাসীর লোক নদীবক্ষ থেকেই টাকার লোভ দেখিয়ে মতিলালের দল ভাঙিয়ে সব অভিনেতা-যন্ত্রীদের নিয়ে এলো নবদ্বীপে। আর তাদের নিয়েই মুক্তামণি সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা দলও তৈরি করে ফেললেন। দলের নামকরণ হল, বউ কুণ্ডুর দল।

এই অবস্থায় মতিলাল বিপন্ন হলেন, অনুরোধ করলেন মুক্তামণিকে, অন্তত শান্তিপুরে যাতে তিনি গান করে সম্মান বাঁচাতে পারেন তার জন্যে তাঁর লোকদের ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু বউ কুণ্ডু সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বউ কুণ্ডুর দল আসরে নেমে পড়েছিল প্রহ্লাদ চরিত্র, ব্রজলীলা পালা নিয়ে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দল খ্যাতিও পেল। তবে মতিলাল চুপ করে বসেছিলেন না। তিনি দলকে আবার নতুন করে এমনভাবে সাজালেন যে, তার দাপটে বউ কুণ্ডুর দল কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পরে শোনাব এই ধরনের আর একটি মহিলা যাত্রা দলের কাহিনী, যে দলটির নামে চন্দননগরে আজও একটি পথ চিহ্নিত হয়ে আছে—'বউ মাস্টারের গলি'।

ইদানীং যাত্রায় এই দলভাঙাভাঙি ব্যাপারটা বড় প্রকট। বউ কুণ্ডুর কাহিনী শোনার পর হয়তো অনেকেই মনে করতে পারেন এই দল ভাঙাভাঙি বা দলবদলের ব্যাপরটার প্রবর্তক বউ কুণ্ডু, এ ব্যাপারে দ্বিমতের কোন কারণ নেই।

ডেভিড লীনের নতুন ভাবনার ছবি 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'

'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'র বিরাট শুটিং পর্ব শেষ হয়ে গেছে ব্যাঙ্গালোর শহরে কয়েকমাস আগে। সেই প্রখ্যাত লেখক ই.এম.ফর্স্টারের লেখা 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' ছিল ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্রদের পড়ার বই। কেবলই পরীক্ষার জন্যে পড়া, সময়কালে চরিত্রদের মানসিকতা, প্রেম, কল্পনা শিল্পের রসবোধে তাকে জানা। সেই বিখ্যাত উপন্যাস আজ পড়ার পাতা থেকে সেলুলয়েডের ফ্রেমে গাঁথা হচ্ছে মালার মত করে। সেলুলয়েডের মালাটি গাঁথছেন বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক ডেভিড লীন।

ডেভিড লীন বলেছেন, "ফর্স্টার সাহেবকে সেলুলয়েডের ভাষায় অর্থবহ করে তোলা আমার উদ্দেশ্য। প্রাধান্য পাবে চরিত্রদের অন্তর্জগতের ঘটনাবলি; দেখানো হবে মানুষের মনোজগতের ট্রানাপোড়েনকে। মূল কথা সাহিত্য হবে চলচ্চিত্রের সঙ্গী।" বলাবাহুল্য, ডেভিড লীন এই পঁচাত্তর বছর বয়সে আবারও সিনেমা শিল্পের কাজে হাত দিলেন তাঁরই নিজস্ব মনের তাগিদে, শিল্পের স্বার্থে। ডেভিড লীন প্রায় চোদ্দ বছর পরে, তাঁর নতুন ছবি 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' নির্মাণে হাত দিলেন। তাঁর শেষ ছবির নাম ছিল 'রায়ানস্ ডটার'।

একটা কথা আমাদের মনে পড়ে লীন সাহেবকে আলোচনায় রাখলে। ডেভিড লীনকে আমরা ভারতবর্ষে সার্থক পরিচালক হিসেবে পাই আজ থেকে প্রায় চব্বিশ বছর আগে 'এ ব্রীজ অন দা রিভার কোয়াই' ছবিতে। এর পর আমরা পাই সেই মনমাতানো ছবি 'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া'-যেখানে তাঁর সিনেমাটিক ভাবনা আঙ্গিককে ও বিষয়ে বিরাট অর্থ পরিগ্রহ করে। তার পর আসে তাঁরই হাতে তৈরি 'ড: জিভাগো'। যাকে লীন জানালেন "পিরিওডিক সিনেমা" বলে। এবং আজ 'রায়ানস্ ডটার' ছুঁয়ে 'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়াতে' আবারও আমরা ডেভিড লীনকে দেখব, চোখ সার্থক করব। ডেভিড লীন তাঁর চলচ্চিত্র শিল্পকর্মের জন্যে আটটি অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন এ পর্যন্ত। জীবন, শিল্প কর্ম-সবই চলছে লীন সাহেবের পাশাপাশি। হয়তো আবারও ছিনিয়ে নেবেন বিশ্ব চলচ্চিত্র পুরস্কারটি, তাঁর নবনির্মিত ছবির সুবাদে।



ভিক্টর ব্যানার্জি ছবি : সমর দাস

ডেভিড লীন জানিয়েছেন ঃ "আমার ছবিতে ড: আজিজকে সম্পূর্ণ নতুন বিশ্লেষণে খুঁজে পাওয়া যাবে। সেখানে মিস কোয়েস্টেডের 'অ্যালেজড মোলেস্টেসন'কে শুধু প্রাধান্য দেয়া হবে না। প্রাধান্য পাবে মুখ্য চরিত্র ড: আজিজ, যার চলা-বলার আদলে রাখা হবে গল্পের মূল সত্যটি।" মালাবার গুহাতে ঘটে যাওয়া বৃত্তান্ত, চন্দ্রপুরের 'রেসিয়াল' কাণ্ডকারখানা, ড: আজিজের মনোযন্ত্রণা, মিস কোয়েস্টেডের হ্যালুসিনেসন্, মিস্টিক পণ্ডিতের ব্যক্তি ব্যবহার-সবই রাখা হয়েছে সিনেমায় অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে, শিল্পের নতুন তত্ত্বের স্বা[illegible], সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে। হয়তো ডেভিড লীন আবারও সমগ্র ছবিটিকে 'পিরিওডিক পীস' হিসেবে দেখতে চাইছেন। তার কারণও মেলে যখন আমরা তাঁকে ব্যাঙ্গালোর প্যালেসে, মাইসোর মহারাজার রাজবাড়িতে নিখুঁত ভাবে শুটিং করতে দেখি।

'এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া'র কিছু বৈশিষ্ট্য আপাতভাবে চোখের সামনে ভাসে। যেমন বাংলার ভিক্টর ব্যানার্জির অবতরণ ড: আজিজের ভূমিকায়। ব্রিটিশ অভিনেতা অ্যালেক্ গিনেস অভিনয় করছেন মিস্টিক্ ব্রাহ্মণ গডবোলের চরিত্রে। অস্ট্রেলিয়ার এক অভিনেত্রী অভিনয় করছেন মিস কোয়েস্টেডের চরিত্রে। রনি হিলশপ করবেন নিগেল হাভারস চরিত্রটি। আমাদের কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবশ্যই ভিক্টর ব্যানার্জির অংশগ্রহনকে কেন্দ্র করে। তাও আবার ডেভিড লীনের ছবিতে। ভিক্টরের আগে অবশ্য আর একজন ভারতীয় অভিনেতা অভিনয় করেছেন ডেভিড লীনের 'লরেন্স অফ অ্যারাবিয়া' ছবিতে। তিনি হলেন সদ্য প্রয়াত শিল্পী আই.এস. জহর।

বিশেষ প্রতিনিধি

রঙ্গনাট্য প্রযোজিত 'অজানা গপ্পো'

গত ২২ অক্টোবর মুক্তাঙ্গনে রঙ্গনাট্য গোষ্ঠী উপস্থিত করলেন তাঁদের বহু অভিনীত নাটক 'অজানা গপ্পো'। সত্যজিৎ রায়ের গু-গা-বা-বা চরিত্র দুটি প্রদীপ দাস কৃত এ নাটকের প্রেরণা।

কাহিনী গুপী বাঘার মনে আমিত্ব জেগে ওঠায় তারা নিজেকে মনে করে অপরের চেয়ে বেশি শক্তিধর। এই কলহ মীমাংসার জন্য তারা কৈলাসে মহাদেবের কাছে উপস্থিত হয় (হঠাৎ গুপী-বাঘার কৈলাসে মহাদেবের কাছে যাবার কথা মনে পড়ল কেন, তা বোঝা গেল না)। মহাদেব তাদের কথা শুনে দু'জনকে মর্ত্যের বিপরীত দুই প্রান্তে গিয়ে নির্দিষ্ট দিনে আবার কৈলাসে ফিরে আসতে বলেন ফল ঘোষণার জন্যে। গুপী-বাঘা যথাক্রমে মল্লা ও চম্পানগরে উপস্থিত হয়। চম্পানগরের রাজা বীরেন্দ্র মল্লা রাজকন্যা কমলিকাকে বিবাহের প্রস্তাব মল্লারাজা প্রত্যাখান করলে, বীরেন্দ্র শর্মা কমলিকার পাণিপ্রার্থী কুমারকে বন্দী করে। বাঘার চেষ্টা ও রাজকর্মচারীর সহযোগিতায় কুমার মুক্তি পায় (রাজকর্মচারী বাঘার কথা শুনেই রাজবিদ্রোহী হয়ে যাবে? আলাদা হয়ে যাওয়ায় গুপী-বাঘার অলৌকিক শক্তিতো নষ্ট হয়ে গেছে, তবে?)। কমলিকা একাকী কুমারের জন্য উতলা হয়ে চম্পানগরে এলে কুমারের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু সে বন্দী হয় (একাকী মূল্যবান অলংকারে ভূষিতা হয়ে রাজকন্যা কমলিকার চম্পানগরে আগমন অসহজ ঠেকে)। বীরেন্দ্র কমলিকাকে বিবাহ করার আয়োজন করে। গুপী-বাঘা পরস্পরের কথা ভাবে এবং নির্দিষ্ট দিনে কৈলাসে গিয়ে মহাদেবকে তাদের উপলব্ধির কথা জানিয়ে আসে যে তাদের

একক কোন শক্তি নেই, মিলিত শক্তিই তাদের শক্তি। মহাদেব তাদের ভূতের রাজার বর ফিরিয়ে দেয়। তারা চম্পানগরে এসে রাজকর্মচারীদের সহযোগিতায় সকল সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে কুমার ও কমলিকার মিলন ঘটায় (রাজকর্মচারীরা কমলিকাকে বন্দী করার সময় কমলিকার কিছু মানবতার কথা শুনেই তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, তার ফলেই তাদের এই সহযোগিতার হাত বাড়ানো)। নাটকে মহাদেব প্রসঙ্গ বাদ দিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, প্রধান কাহিনীর সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। শেষ গানটি ব্যতীত সবকটি গানই পুনরাবৃত্তি দোষদুষ্ট, যা নাটকে একেবারেই অচল। নাটকের সব ঘটনাই নাট্যকারের ইচ্ছেমত হয়েছে ঘটনার অবশ্যম্ভাবিতা এখানে একেবারেই নেই।

মঞ্চ পরিকল্পনা (অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়) নাটকের গতিকে খর্ব করেছে। বার বার আলো নিভিয়ে সেট পরিবর্তন করে পরবর্তী দৃশ্য প্রস্তুত করায় নাটকের সাবলীল গতি ব্যাহত করেছে। আবহসঙ্গীত মন্দ নয়। আলো (দীনা মিত্র) যথাযথ। নির্দেশকের (অশোক চট্টোপাধ্যায়) কিছু কিছু কম্পোজিশন সৃষ্টির চেষ্টা ভাল, কিন্তু সেই চেষ্টাও অভিনয়শিল্পীরা অসহজ চলাফেরায় নষ্ট করেছেন। প্রস্তাবনা দৃশ্যটি ভাল লাগে। রূপসজ্জা (মনু দত্ত ভাল)।

অভিনয়াংশ দুর্বল। অধিকাংশ অভিনেতার সংলাপ ফাম্বল করেছে। একমাত্র নারী চরিত্রে সোমা গঙ্গোপাধ্যায় (কমলিকা) যথাযথ, ওর এর বেশি কিছু করারও ছিল না।

দীপক পোদ্দার

সংক্ষিপ্ত পাক্ষিক রাশি ও লগ্নফল

১৬ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৪

মেষ ঃ যাদের জন্ম অশ্বিনী ও ভরণী নক্ষত্রে তাদের লাভের যোগ আছে। নতুন ব্যবসা-আরম্ভে অভাবনীয় শুভ ফল পাবেন। কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হলে মান-সম্মান, ঐশ্বর্য ও পারিবারিক সুখবৃদ্ধি। শারীরিক শুভ। প্রেমের ক্ষেত্রে অঘটন ঘটার সম্ভাবনা নেই, তবে আগুন থেকে সাবধান। শুভ তারিখ – ১৬, ১৮ ও ২১। মেষ লগ্নের জাতিকার কর্মে অশান্তি, বায়ুবৃদ্ধি ও কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আর্থিক কষ্টে পড়তে পারেন, সন্তানের শরীর চিন্তায় ফেলতে পারে।

বৃষ ঃ ঐশ্বর্য, সম্মান ও মূলধন বৃদ্ধির শুভযোগ আছে। যেচে অন্যের সাহায্য না নেয়াই ভাল। প্রকৃত বন্ধুর কথা ভুলে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির দ্বারস্থ হলে ভুল করবেন। অনিয়ম ও অত্যধিক পরিশ্রমে শারীরিক অবনতি ঘটতে পারে। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ। শুভ তারিখ – ১৮, ২০, ২১ ও ২৯। বৃষ লগ্নের জাতিকার বন্ধু ও আত্মীয়সহ এ পক্ষটা সুখেই কাটবে। পুরাতন রোগ পুনরায় বা নতুন কোন রোগ হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

মিথুন ঃ মৃগশিরা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে যাদের জন্ম তাদের ব্যবসায় বিশেষ লাভের যোগ আছে এবং আর্থিক অচল অবস্থার সুপরিবর্তন হবে। পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্ম হলে বিশেষ ক্ষেত্রে সম্মানবৃদ্ধি। প্রেমের ক্ষেত্রে আশাতীত শুভফল আশা করা যায়। সম্ভাবস্থলে সন্তানলাভ হতে পারে। শুভ তারিখ – ১৬, ২৬ ও ২৭। মিথুন লগ্নের জাতিকার আয়-উপার্জন ভাল হলেও অপ্রত্যাশিত ব্যয়ের চাপে বিব্রত হতে হবে।

কর্কট ঃ পুনর্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম যাদের তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভাবস্থলে উপরি কিছু লাভ ও বৃহৎ যোগাযোগ আসতে পারে। অপর পক্ষে অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম হলে অপমান ও নানা বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হবার যোগ আছে। গ্যাসের রোগ হতে পারে। শুভ তারিখ – ১৮, ২৮ ও ২৯। কর্কট লগ্নের জাতিকার মানসিক চঞ্চলতা ও শারীরিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে।

সিংহ ঃ মঘা নক্ষত্রে জন্ম হলে রোগ ব্যাধির প্রকোপে বিশেষ কষ্ট ভোগ করতে হবে। যাদের জন্ম পূর্বফাল্গুনী ও উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে তাদের হঠাৎ ভোগসুখ বৃদ্ধি পাবার যোগ আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব বজায় থাকবে। পরিবারে প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। শুভ তারিখ – ১৬, ২০ ও ২৩। সিংহলগ্নের জাতিকার সম্পত্তি বৃদ্ধির যোগ আছে। স্বামীকে ভুলবোঝা বা তার সঙ্গে মতবিরোধ করা উচিত নয়।

কন্যা ঃ এ পক্ষ বিশেষ শুভ। ভোগসুখ বৃদ্ধি এবং সম্মান বৃদ্ধির যোগ আছে। তুচ্ছ কারণগুলিকে উপেক্ষা করতে পারলে বিশেষ লাভবান হওয়া সম্ভব। নিজের অজান্তে কারো মনে দুঃখ দেওয়া বিষয়ে সাবধান। ধাতুজ রোগ বা পায়ুদেশে অন্য রোগের সূচনা হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার উদারতা আপনাকে ভুল পথে টেনে নিতে পারে। শুভ তারিখ – ১৮, ২০ ও ২৮। কন্যা লগ্নের জাতিকার মানসিক দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। স্বামীর কর্মক্ষেত্রে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে।

তুলা ঃ জন্মকালে অন্যান্য গ্রহের অবস্থান যদি শুভ হয় তবে এপক্ষ বিশেষ শুভসূচক। পূর্বের মানসিক ভারসাম্য অনেকাংশে দূর হবে। উপরন্তু চিত্রা নক্ষত্রে যাদের জন্ম তাদের ভোগসুখ বৃদ্ধি পাবে। স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হলে মানসম্মান বৃদ্ধির বিশেষ যোগ আছে। শত্রুরা বশীভূত হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি ত্যাগ না করলে বিশেষ ক্ষতি হবে। শুভ তারিখ – ১৯, ২০ ও ২৮। তুলা লগ্নের জাতিকার আত্মীয় বিরোধিতা, দাম্পত্যসুখ থাকলেও আর্থিক অনটন চলবে।

বৃশ্চিক ঃ কোন নিকট আত্মীয় বা সন্তানের ব্যবহারে মানসিক আঘাত পাবেন। তবে নিজ ব্যক্তিত্ব বা মানসম্মানের কোন ক্ষতি হবে না। চর্ম বা লিভারঘটিত পীড়া হলে প্রথমাবস্থায় সাবধান হবেন। কোন শুভ যোগাযোগ আসতে পারে। শুভ তারিখ – ১৯, ২২ ও ২৮। বৃশ্চিক লগ্নের জাতিকার সদ্‌গুরুর কৃপায় মানসিক অশান্তি কিছুটা দূর হবে। তবে শারীরিক অসুস্থতায় নাজেহাল হবে।

ধনু ঃ মূলা ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হলে বিশেষ শুভ। মানসম্মান বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হলে প্রেম, আর্থিক বা অন্য কোন ক্ষেত্রে বন্ধন-ভয়ের যোগ আছে। নিঃসঙ্গতা-বোধে ক্ষতি হতে পারে। আত্মীয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। শুভ তারিখ – ১৬, ১৯ ও ২৭। ধনু লগ্নের জাতিকার হঠাৎ কারো দ্বারা লাঞ্ছিত হবার যোগ আছে। উন্নতির পথে কোন নিকটজনের দ্বারা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে। সন্তানের জন্য দুর্ভাবনা।

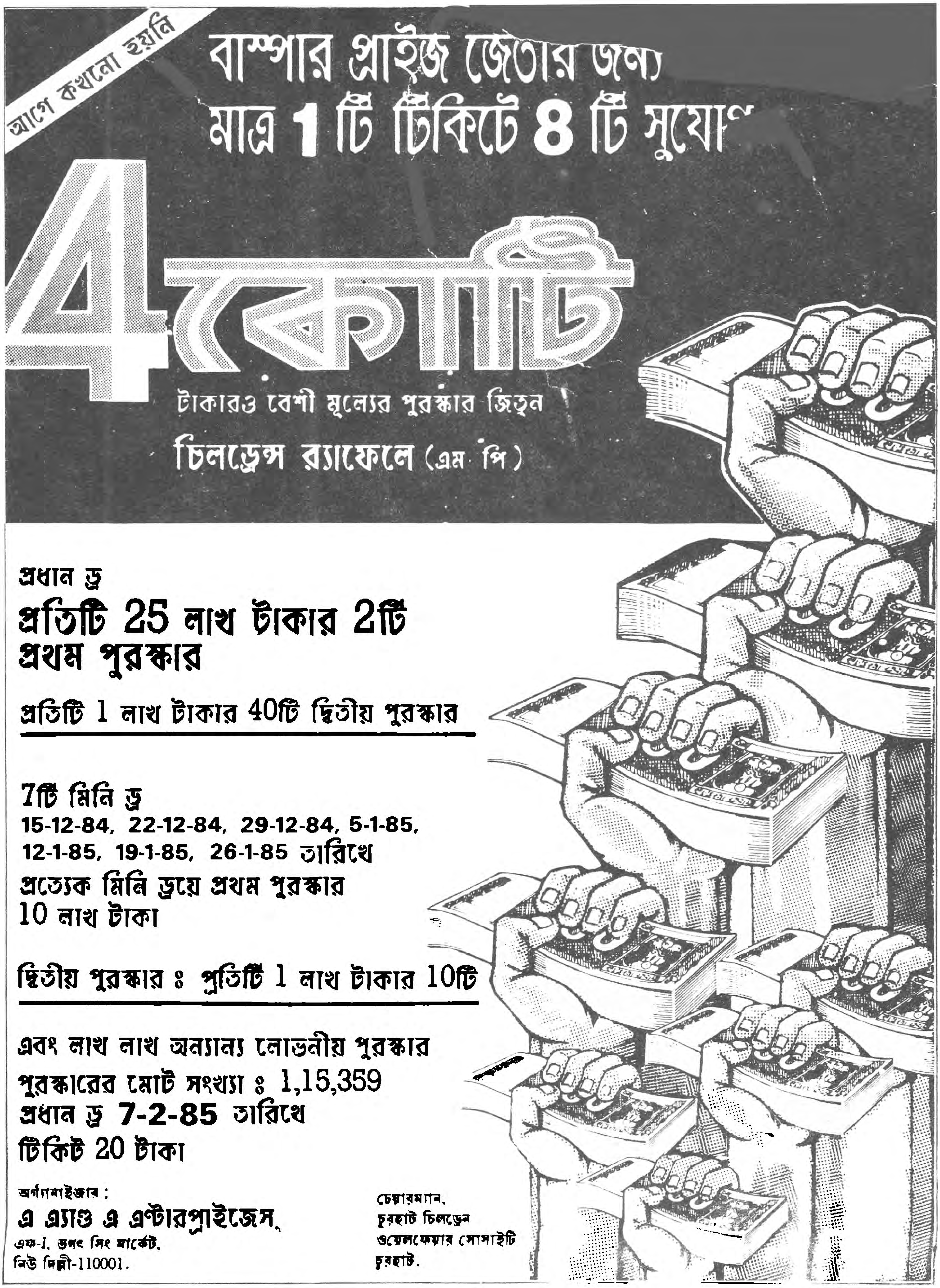
মকর ঃ এ পক্ষ বিশেষ অশুভ সূচক। কোন পূর্বোপকৃত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। নিঃসঙ্গতাবোধ ও বন্ধনভয় যোগ আছে। অবাঞ্ছিত কোন ঘটনায় মানসিক আঘাত পেতে পারেন। কোন সত্যিকারের উপকারী ব্যক্তির সান্নিধ্যে শান্তি। শুভ তারিখ – ২৫, ২৭ ও ২৯। মকর লগ্নের জাতিকা নিকটজনের আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। এ পক্ষের প্রথমদিক অশুভ হলেও শেষেরদিক কিছুটা শুভ। ভ্রমণযোগ আছে।

কুম্ভ ঃ ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম যাদের তাদের বিশেষ অশুভ। নিঃসঙ্গতাবোধ। বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বন্ধনভয় পরিলক্ষিত হয়। অপরপক্ষে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হলে লাভ ও সম্মান বৃদ্ধির যোগ আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ, সাময়িক মনোমালিন্য হতে পারে। শুভ তারিখ – ২০, ২২ ও ২৪। কুম্ভ লগ্নে জাতিকার সম্পত্তিগত বিষয়ে অথবা পিতামাতার সঙ্গে সাময়িক গোলযোগ সৃষ্টি হতেপারে। আর্থিক টানাটানি চলবে।

মীন ঃ ব্যবসায় উপরি কিছু লাভ হতে পারে। কর্মস্থলে শত্রুদমন হবে এবং সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। তৎপর না হলে বিশেষ সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। যকৃতের ও গ্যাসের রোগ থাকলে সাবধান হওয়া উচিত। ধর্মীয়ভাব বৃদ্ধি পাবে। শুভ তারিখ – ২১, ২৩ ও ২৮। মীন লগ্নের জাতিকার সদ্‌গুরুর কৃপায় শান্তি। সতর্ক না হলে কোন কুমতলবী লোকের দ্বারা ক্ষতি। দাম্পত্যজীবন সুখের হলেও আর্থিক চিন্তা থাকবে।

শ্রী গৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ঃ ২৪-০[illegible]), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, রেজিঃ অফিস, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex 021-5092 IPPL IN


আগে কখনো হয়নি
বাম্পার প্রাইজ জেতার জন্য
মাত্র 1 টি টিকিটে 8 টি সুযোগ
4 কোটি
টাকারও বেশী মূল্যের পুরস্কার জিতুন
চিলড্রেন্স র‍্যাফেলে (এম. পি)
প্রধান ড্র
প্রতিটি 25 লাখ টাকার 2টি
প্রথম পুরস্কার
প্রতিটি 1 লাখ টাকার 40টি দ্বিতীয় পুরস্কার
7টি মিনি ড্র
15-12-84, 22-12-84, 29-12-84, 5-1-85,
12-1-85, 19-1-85, 26-1-85 তারিখে
প্রত্যেক মিনি ড্রয়ে প্রথম পুরস্কার
10 লাখ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ প্রতিটি 1 লাখ টাকার 10টি
এবং লাখ লাখ অন্যান্য লোভনীয় পুরস্কার
পুরস্কারের মোট সংখ্যা ঃ 1,15,359
প্রধান ড্র 7-2-85 তারিখে
টিকিট 20 টাকা
অর্গানাইজার :
এ এ্যাণ্ড এ এণ্টারপ্রাইজেস,
এফ-I, ভগৎ সিং মার্কেট,
নিউ দিল্লী-110001.
চেয়ারম্যান,
চুরহাট চিলড্রেন
ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
চুরহাট.

Sulekha

SUKANYA 16 NOVEMBER 1984
Declaration No. 42/84
Postal Regn. No.
WB/CC-423 Rs. 3.50

